'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চতুর্থ সংখ্যা

কারিগরের বাহাদুরি

বিজ্ঞান-ভিক্ষু

বেঙ্গল ম্যাস্ এডুকেশন সোসাইটী
৯৯।১ এফ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার,
কলিকাতা, ৪।

মূল্য ।৹

প্রকাশক
শ্রীবিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ
৯৯।১ এফ্, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা, ৪।

দ্বিতীয় সংস্করণ

সর্ব্বস্বত্বে অধিকারী :
B. Mukherjee & Bros.

প্রিন্টার—শ্রীঅনঙ্গ কুমার মুখোপাধ্যায়
চলন্তিকা প্রেস
২নং রাণী দেবেন্দ্রবালা রোড,
পাইকপাড়া, কলিকাতা—২

ভূমিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পুস্তকমালার চতুর্থ পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইংরাজী ভাষায় এরূপ ধরণের বহু পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক একেবারে নাই বলিলেই চলে। দেশের ছেলে মেয়েদের হাতে এরূপ পুস্তক তুলিয়া দিলে তাহাদের মনে বিজ্ঞান বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগিতে পারে এই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকমালা পরিকল্পিত হইয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে কারিগুরির বাহাদুরি বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রয়োজনের অনুরোধে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। কারিগরের প্যাঁচে পড়িয়া জড় বুদ্ধিমান জীবের মত কাজ করে। এই পুস্তকে দুই চারিটি মাত্র কারিগরের বাহাদুরির পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল।

এই পুস্তকের আগাগোড়া প্রুফ্ আমার বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয় দেখিয়া দিয়া আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি তিনি না দেখিয়া দিলে এত শীঘ্র বাহির হইত কিনা সন্দেহ। ইতি—

প্রথম সংস্করণ
শ্রীপঞ্চমী,
১৯ মাঘ, ১৩৫৭

গ্রন্থকার

সূচী পত্র

বিষয়	পাতা
কারিগরের কারিগুরি	১
চীনের প্রাচীর	৪
ভাসমান ডক	৬
পাহাড় খুদিয়া মানুষের মুখ আঁকা	৯
কলের কোদালি	১২
নদীর তলদেশ হইতে পুলের ভিত্তি গাঁথিয়া তোলা	১৬
নদীতে বাঁধ	১৯
খাল পথ	৩৪
উচ্চ প্রদেশে জাহাজ তোলা	৪৫
জুইডার জী	৪৯
পিরামিড্	৫২
চলন্ত সোপান	৫৭
কলে কাপড় কাচা	৫৮
রেল ইঞ্জিনের জন্মকথা	৬১
কারিগরের সেরা কীর্ত্তি	৬৭
ভূগর্ভে রেল পথ	৭২
পার্ব্বত্য রেল পথ	৭৯
এক খিলান পুল	৮১
শূন্যে দড়ি পথ	৮৫
তার তুলিবার কৌশল	৯০
বসুন্ধরা	৯৮

কারিগরের কারিগুরি

'Nothing is created 'de novo'

মানুষ নূতন কিছুই সৃজন করিতে পারে না। কোন বস্তুর উপাদানই বল আর শক্তিই বল, মানুষ সঞ্চিত (Potential) কে সক্রিয় (active) করে মাত্র। মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে পদার্থের গুণাগুণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে পারায় উহাকে বশে আনিয়া কাজ করাইতে শিখিয়াছে। ধর এক-খানি ইঞ্জিন একসারি ভারী গাড়ী টানিয়া কত না পথই অবিরাম ছুটিয়া চলে। ইঞ্জিন গাড়ীগুলিকে টানে, কিন্তু কিসের বলে টানে? কয়লার মধ্যে যে সৌরশক্তি সঞ্চিত ছিল, মানুষ উহাকে জ্বালাইয়া তাহাই ক্রিয়মাণ করে এবং উহাকে দিয়া তরল জলকে বিস্তারশীল বাষ্পে পরিণত করে। তাহার পর উক্ত বাষ্পের বিস্তারশীলতার গুণ বা ধর্ম্মকে কাজে লাগাইয়া কঠিন ও মানুষের অসাধ্য কাজ করাইয়া লয়।

কয়লার তাপ হইতে বিদ্যুৎ

কলিকাতা ইলেট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন। এইজন্য তাঁহারা কাশীপুর কারখানায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন। তাঁহারা নূতন কিছুই করেন না, কয়লার মধ্যে যে সঞ্চিত তাপ এতদিন গূঢ় ছিল, তাহাকেই সক্রিয় করিয়া বিদ্যুতে রূপান্তরিত করেন মাত্র।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হইতে বিদ্যুৎ

জলপ্রপাতের সাহায্যে আজকাল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এক্ষেত্রেও নূতন কিছুই করা হয় না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বশে উচ্চ হইতে নিম্নে পতনের মুখে জলপ্রপাতের বিশাল জলধারার বিষম বেগের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র (Dynamo) চালাইয়া লওয়া হয়। ফলে মাধ্যাকর্ষণ

শক্তি জলের কাঁধে চাপিয়া আসিয়া ডায়নামোর প্যাঁচে পড়িয়া বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

বায়ুর শক্তি

মানুষ ঠিক এই রকমেই বায়ুর ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে পারিয়া উহাকে কাজে লাগাইয়াছে। 'Nature abhors vacuum'; প্রকৃতি দেবীর নাকি কোথাও ফাঁক নাই। তাঁর এই বিরাট সৃষ্টির মাঝে নাকি কোথাও ফাঁক পাওয়া যায় না। ফাঁক বা ফাঁকি নাকি তাঁহার অসহ্য;

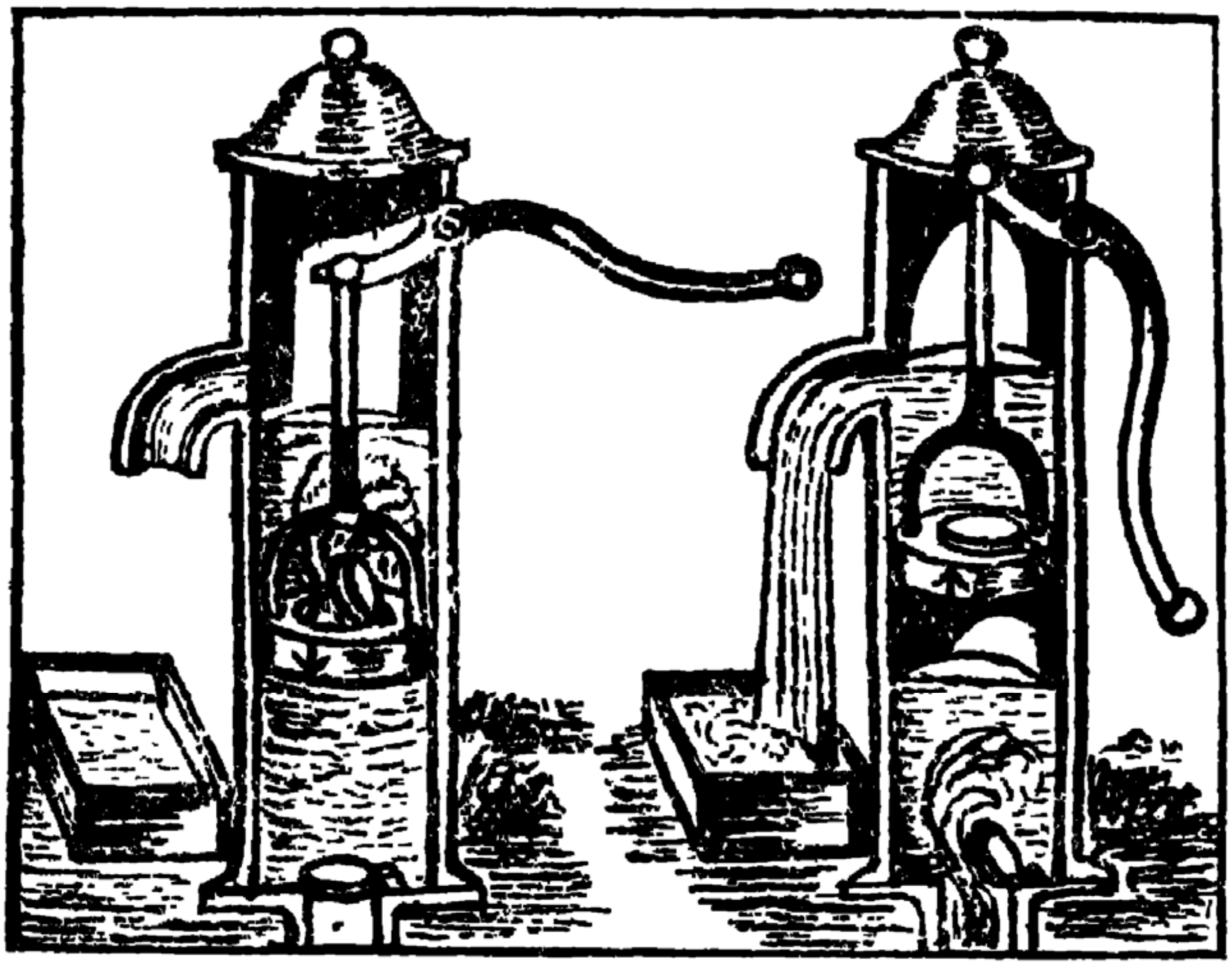

সেইজন্য কোথাও দৈবাৎ ফাঁক পড়িলে, তৎক্ষণাৎ যাহা কিছু নিকটে পান, তাহা দিয়াই উহা বুজাইয়া দেন। এই বিধির সুযোগ লইয়া মানুষ পাম্প গড়িয়াছে।

দুই প্রকারের পাম্প ব্যবহার হয়। প্রথম, শোষণ পাম্প; দ্বিতীয়, ঠেলা পাম্প।

শোষণ পাম্প

হাতল তুলিলে পাম্প মধ্যস্থিত ডাঁটিটী (piston) নামিতে থাকে

এবং ইহার ভাল্বের (ডাঁটির চাকতির গায় কব্জায় আঁটা একটী ক্ষুদ্র দ্বার) মুখ খুলিয়া যায়। পিস্টন্টী নামায় জলের চাপে নলকূপের মুখের পর্দ্দা (Valve) বন্ধ হইয়া পড়ে। তখন নলের জল নামা পিস্টনের চাপে নলকূপের মধ্যে যাইতে না পাইয়া, পিসটনের পর্দ্দা খোলা পাওয়ায় উপরে উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

হাতলটি নামাইলে পিস্টনটী উঠিতে থাকে; তখন পিস্টনের ও নলকূপের মুখের মাঝে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং নলকূপের মুখের পর্দ্দা খুলিয়া যায়। স্থান শূন্য হইবামাত্র জল নল মুখে উঠিয়া দ্রুতগতিতে উহা পূর্ণ করে, ফলে কূপের জল নল দিয়া উপরে উঠিতে থাকে।

ঠেলা পাম্প

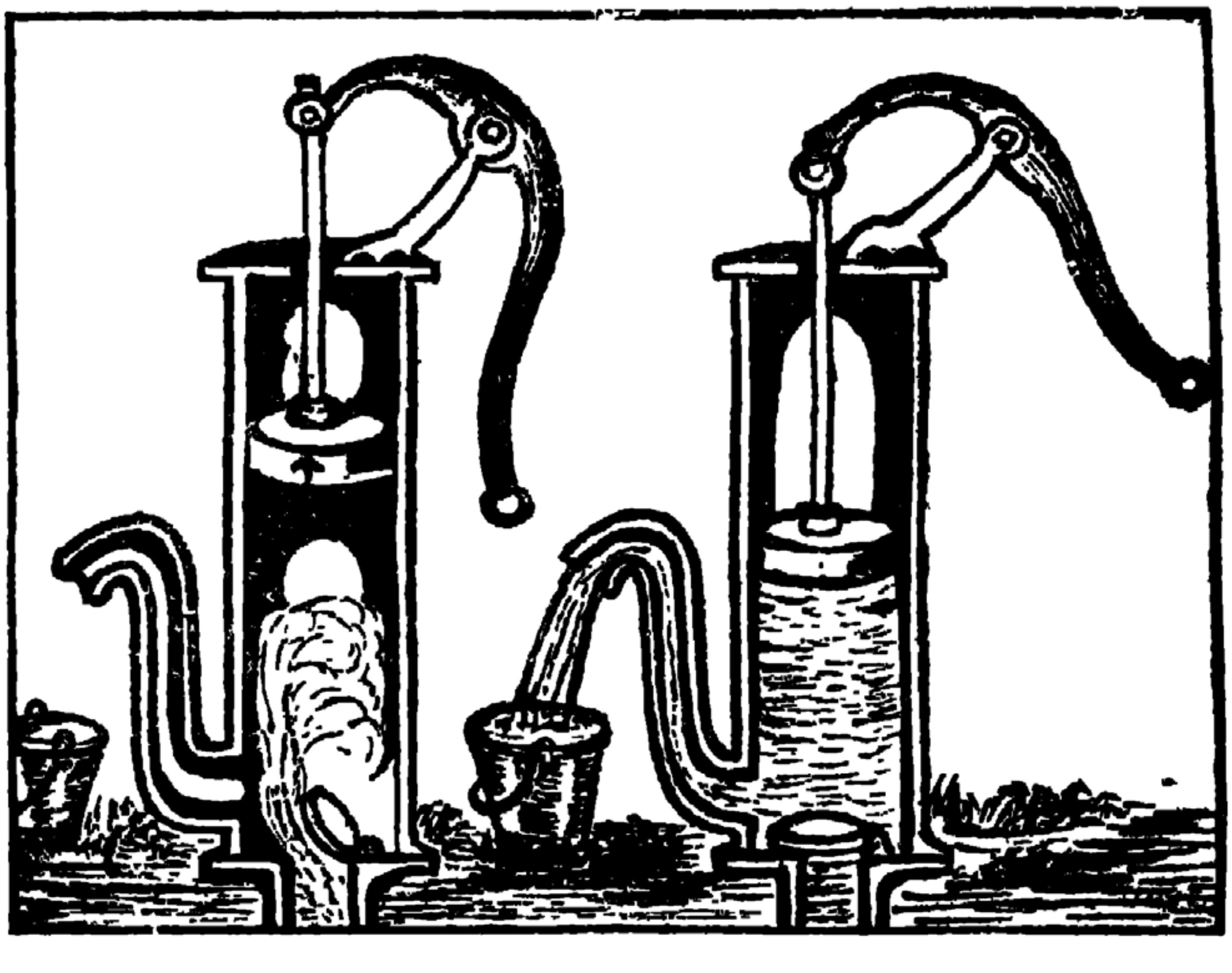

এ ক্ষেত্রে হাতলটী নামাইলে পিস্টনটী উঠিয়া পড়ায় পূর্ব্বের মত জল উঠিয়া আসে। তাহার পর হাতলটী উঠাইলে পিস্টনটী নামিতে থাকে এবং জলের চাপে কূপের মুখের পর্দ্দা বন্ধ হইয়া যায়; ফলে পিস্টনের চাপে জল কূপের মধ্যে নামিতে না পাইয়া পাম্পের মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে।

চীনের প্রাচীর

মানুষের হাতের কাজ প্রকৃতির হাতের কাজের তুলনায় অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। হিমালয়ের তুলনায় পিরামিড বা আমাজন নদের তুলনায় সুয়েজ খাল বা পানামা খাল কিছুই নয়। তবুও মানুষের অন্ততঃ একটা কীর্ত্তি প্রকৃতিদেবীর কীর্ত্তির কাছে দাঁড়াইতে পারে।

চীনের বিশাল প্রাচীর গড়িয়া কারিগর ধৈর্য্যের ও শক্তির বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে। খ্রীষ্ট জন্মিবারও দুইশত বৎসর পূর্ব্বে চীন সম্রাট্ সীঃ হোয়াংতি উত্তরাঞ্চল হইতে আগত অসংখ্য তাতার বাহিনীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই সুদীর্ঘ প্রাচীরটি গঠন করেন।

একালের ফ্রান্সের বিশাল ও শক্তিশালী ম্যাজিনো লাইন (Maginot Line) যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সকে শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে পারিল না, সেইরূপ উক্ত সুদীর্ঘ দৃঢ় প্রাচীর শস্যশ্যামল চীনকে উত্তরাঞ্চলের অনুর্ব্বর দেশের বুভুক্ষু শত্রুবাহিনীর কবল হইতে বাঁচাইতে পারে নাই।

এই প্রাচীরটী দৈর্ঘ্যে ১৪০০ মাইল, এবং প্রস্থে পাদদেশে ২৫ ফুট ও শীর্ষে ১৫ ফুট; ইহা উচ্চে ১৫ হইতে ৩০ ফুট। প্রতি ২০০ গজ অন্তর প্রাচীরের উপর ৪০।৫০ ফুট উচ্চ একটী করিয়া ক্ষুদ্র দুর্গ আছে। এই দুর্গে থাকিয়া সৈন্যগণ দিনরাত্রি পাহারা দিত।

বর্ত্তমানে এই প্রাচীরের সার্থকতা না থাকায় ইহার ১৫ ফুট চওড়া মাথায় একটা মোটর পথের ব্যবস্থা হইতেছে। কালের প্রভাবে ও

সতর্ক দৃষ্টির অভাবে আজকাল ইহার বহুস্থান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ঐ সকল স্থান মেরামত করিয়া লইলে অতি সহজেই ও অতি অল্প

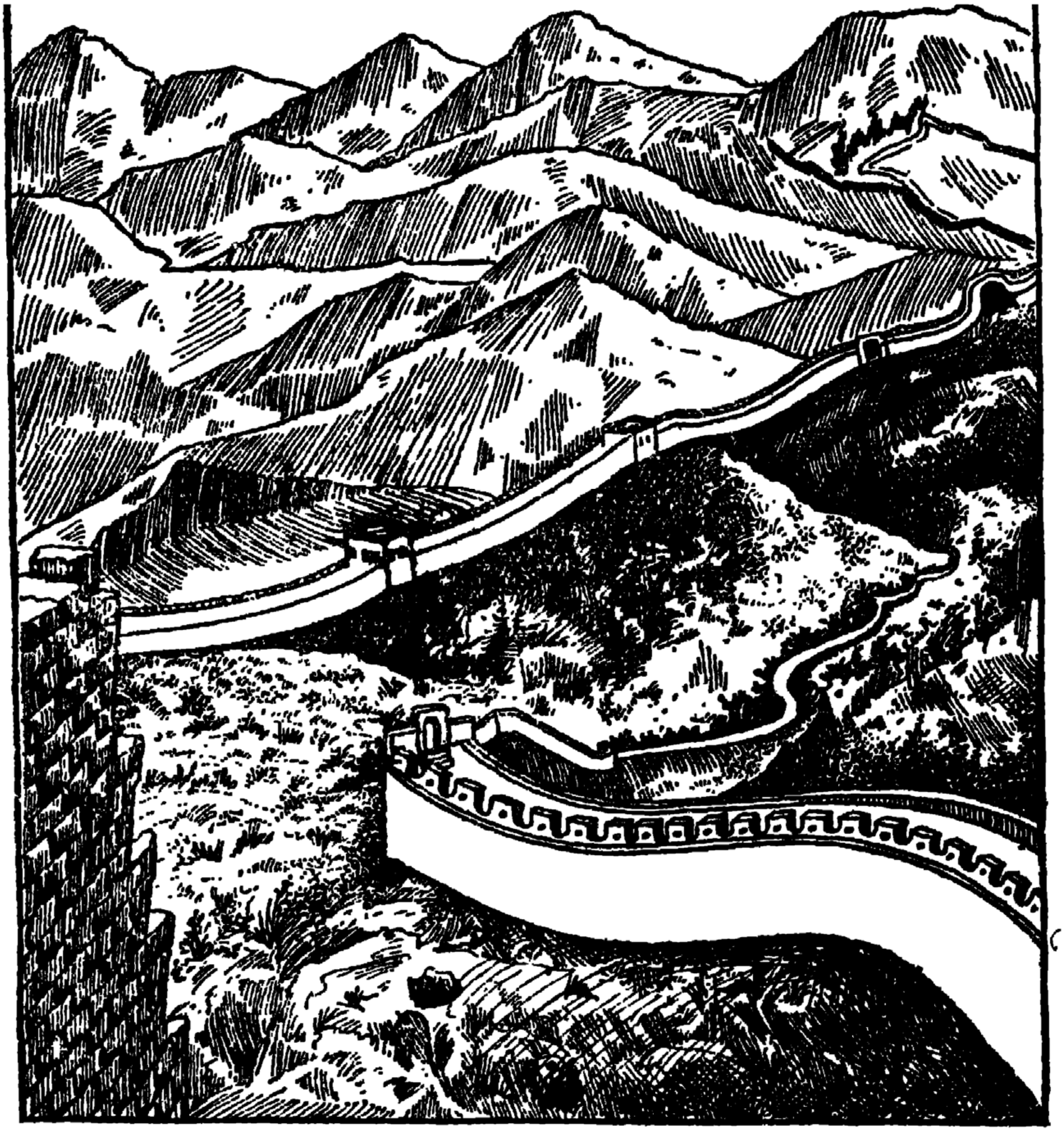

চীনের প্রাচীর

ব্যয়ে ১৪০০ মাইল দীর্ঘ পাহাড়ের মাথায় এক অদ্ভুত মোটর ছুটিবার পথ প্রস্তুত হইবে। কারিগরের বাহাদুরির এই একমাত্র পরিচয় প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে কিছু টেক্কা দিতে পারে।

ভাসমান ডক্ (Floating dry-dock)

জাহাজ কিছুদিন সমুদ্রপথে যাতায়াত করিলেই উহার তলদেশে নানা জলজ জীব ও উদ্ভিদ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহাকে ভারী করিয়া তুলে, ফলে উহার গতিবেগ কমিয়া যায়। তাহার উপর নোনা জলে কিছুদিন জাহাজ থাকিলে জাহাজের লোহার পাতগুলিও মরিচা ধরিয়া ক্ষয় হইতে থাকে। এই সকল কারণে মাঝে মাঝে জাহাজের খোলের বহিরাংশ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া রং করা প্রয়োজন হয়।

পূর্ব্বের ড্রাই-ডক্ (Dry-dock)

পূর্ব্বে জাহাজকে কোন বন্দরে লইয়া গিয়া এক মুখ খোলা বিশাল একটি চৌবাচ্ছায় পুরিয়া দেওয়া হইত। সমুদ্র বা নদীতীরে মাটি কাটিয়া তলদেশ ও চারিপাশ কংক্রীট্ করিয়া এই চৌবাচ্ছাটি নির্ম্মাণ করা হয়। ছোবাচ্ছাটি নদীর ও জলের মাঝে দৃঢ় কপাটের ব্যবস্থা থাকে। কপাট বন্ধ করিয়া দিলে বাহিরের জল চৌবাচ্ছায় প্রবেশ করিতে পারে না। উহা এত বড় যে জাহাজটি সহজেই উহাতে ধরিতে পারে। তাহার পর চৌবাচ্ছার প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিয়া উহার জল শক্তিশালী পাম্প সাহায্যে ছেঁচিয়া ফেলা হয়। জল ছেঁচিতে ছেঁচিতে জাহাজটি ক্রমশঃ নামিয়া চৌবাচ্ছার তলদেশে গিয়া দাঁড়ায়। তখন চৌবাচ্ছার জল বাহির করিয়া ফেলায় উহা শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবে তখন জাহাজটি ডাঙ্গায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় জাহাজটিকে খাড়া রাখিবার ব্যবস্থা থাকে।

এইরূপ বিশাল চৌবাচ্ছাকে ড্রাই-ডক্ (Dry-dock) বলে। জাহাজ এইরূপ ড্রাই-ডকে প্রবেশ করিবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যেই উহাকে জলশূন্য করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

তাহার পর কারিগরেরা দলে দলে কাজে লাগিয়া পড়ে এবং শীঘ্রই জাহাজটিকে আগাগোড়া চাঁচিয়া, রং করিয়া, একেবারে নূতন করিয়া তুলে।

বর্ত্তমানের ড্রাই-ডক্

কিন্তু বর্ত্তমানের যাত্রীবাহী জাহাজগুলি বিশালকায় হওয়ায় দেখা গেল যে উহার উপযুক্ত ড্রাই-ডক্ নির্ম্মাণ করা অতিশয় ব্যয়সাধ্য। তাহার উপর সকল বন্দরে উহা প্রস্তুত করিবার মত শক্ত ভিত্তি পাওয়া যায় না। এইরূপ ড্রাই-ডকের একটী মস্ত অসুবিধা যে উহা যে স্থানে প্রয়োজন সেইস্থানেই নির্ম্মাণ করিতে হয়; জাহাজের মত অন্য স্থানে সুবিধা মত প্রস্তুত করিয়া আনা চলে না এবং একবার প্রস্তুত হইয়া গেলে, প্রয়োজন হইলে অন্য কোথাও টানিয়া লইয়া যাওয়া যায় না।

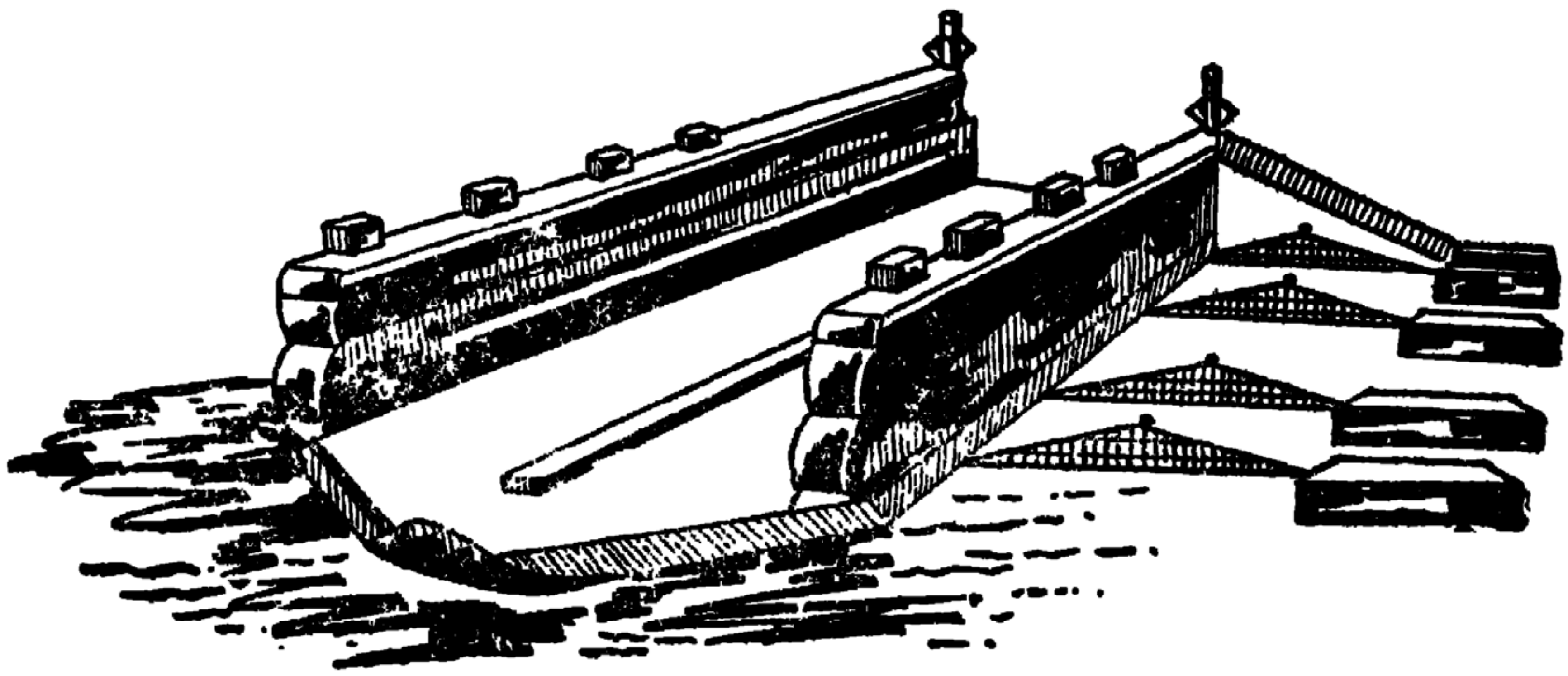

ড্রাই-ডক—জাহাজ প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে

এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য কারিগর অন্য এক উপায় করিয়াছে। এখন সে কংক্রীটের ড্রাই-ডক্ নির্ম্মাণ না করিয়া কাঠ লোহারপাতে মুড়িয়া একটি বিশাল জাহাজের খোল গড়ে। ইহার তলদেশের আকার ইংরাজী U অক্ষরের মত দেখিতে, এবং ইহার উপরের অংশের সম্মুখ ও পিছনের দিক কাটা।

এই কাষ্ঠনির্ম্মিত ড্রাই-ডকের তলদেশে কতকগুলি লৌহনির্ম্মিত মুখ আঁটা চৌবাচ্চা থাকে। এইগুলি প্রয়োজন মত জলপূর্ণ করিলে, উহার তলদেশ জাহাজের তলদেশেরও তলায় গিয়া দাঁড়ায়। তখন জাহাজটীকে টানিয়া ইহার মধ্যে আনা হয়। তাহার পর চৌবাচ্চাগুলির সমস্ত জল পাম্প করিয়া ছেঁচিয়া ফেলা হয়। জল যত ছেঁচা হইতে থাকে, ততই ড্রাই-ডকটি জাহাজটিকে গর্ভে লইয়া জলের উপর উঠিতে থাকে। শেষে জলপূর্ণ খোলটি গর্ভে জাহাজটিকে লইয়া সমুদ্র বক্ষের উপরে উঠিলে, খোলের জলও ছেঁচিয়া ফেলা হয়। তখন কাষ্ঠের শুষ্ক খোলে জাহাজ আসিয়া দাঁড়ায় এবং কারিগরেরা উহাকে ইচ্ছামত আগাগোড়া চাঁচিয়া, রং করিয়া, একেবারে নূতন করিয়া দেয়।

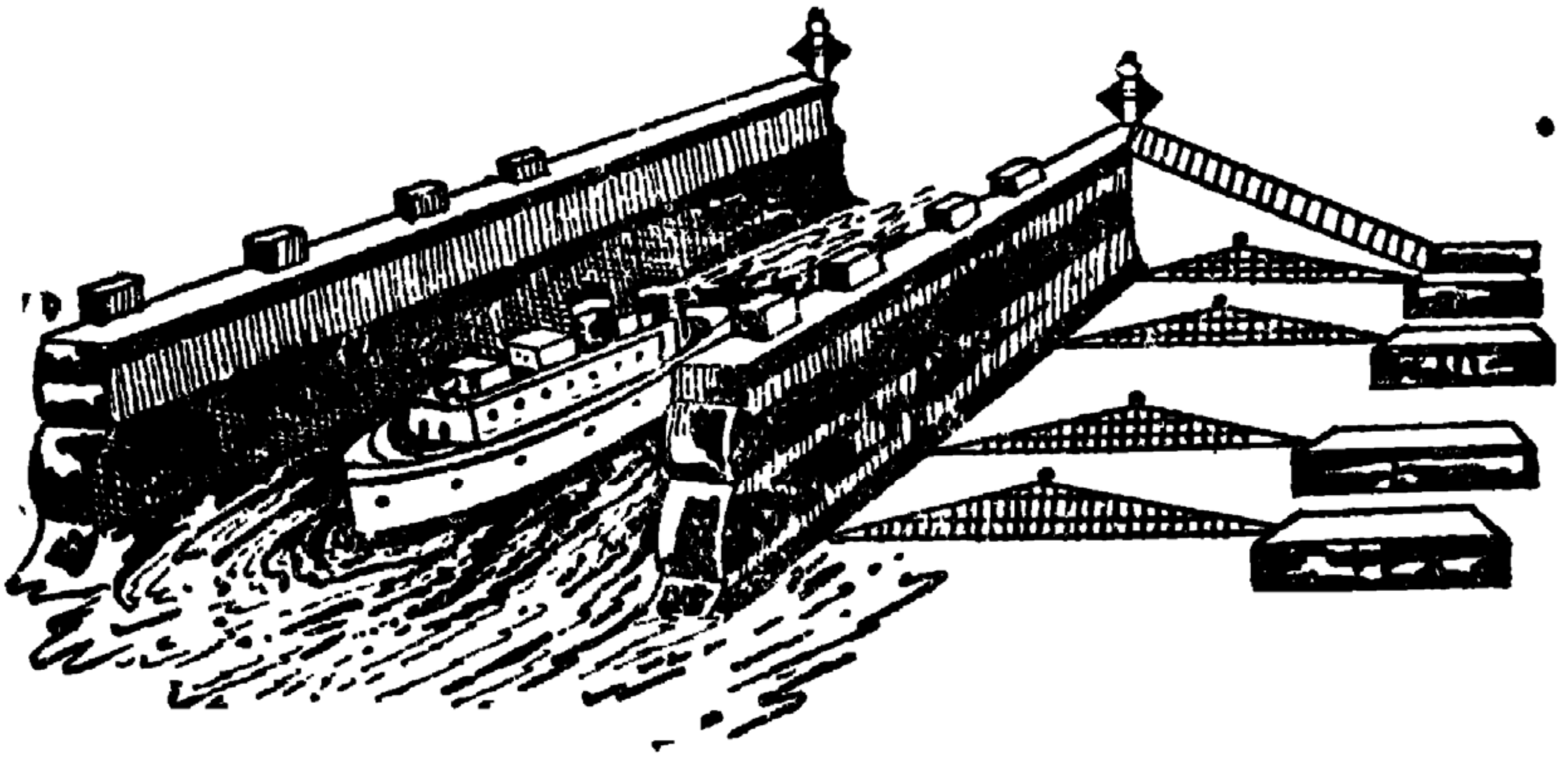

ড্রাই-ডক—জাহাজ শুদ্ধ খোলটী সমুদ্রজলের উপরে উঠিয়াছে

ইংলণ্ডের সাদাম্‌টন বন্দরে এইরূপ একটি বিশাল ড্রাই-ডক্ আছে। উহার তলদেশস্থ চৌবাচ্চাগুলি জলশূন্য করিলে ৬০,০০০ টনের জাহাজকেও লইয়া উহা জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে পারে। ৯১৫ ফুট দীর্ঘ, ১০০ ফুট প্রস্থ ও ৫৮ ফুট গভীর ৫৬,৬২১ টনের Majestic জাহাজখানি ইহাতে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে।

কিছুদিন পূর্ব্বে টাইন্ (Tyne) বন্দরের শিল্পশালায় একটী ৫০,০০০ টনের জাহাজ গর্ভে লইয়া জলের উপরে উঠিয়া ভাসিতে পারে এইরূপ

একটি ড্রাই-ডক্ নির্ম্মাণ করিয়া সিঙ্গাপুরে টানিয়া লইয়া পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর একটী বিশাল ড্রাই-ডক্ সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ১৩,৫০০ মাইল টানিয়া New Zealandএ পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাহাড় খুদিয়া মানুষের মুখ আঁকা

প্রকৃতির কার্য্য

প্রকৃতিদেবী তাঁহার দুই অনুচর জল ও বায়ুর সাহায্যে দিবারাত্র উঁচু পাহাড়কে ভাঙ্গিয়া মনের মত নানা আকারে গড়িতেছেন। বায়ু ও জলের সহযোগে মৃত্তিকায় উদ্ভিদ জন্মিয়া ভাঙ্গা-গড়ার কাজে প্রকৃতিদেবীকে আরও খানিক সাহায্য করে। ঝড়ের মুখে বালি ও কাঁকর উড়িয়া আসিয়া মানুষের হাতের ডিনামাইট ও হাতুড়ির মত কাজ করে। শীত ঋতুতে পাথরের ফাটলে জল জমিয়া বরফ হইয়া ফাঁপিয়া উঠে, উহাও অমিত বিক্রমে বড় বড় পাথরের টুক্‌রা ভাঙ্গিয়া ফেলে; এইরূপে প্রকৃতিদেবীর খোদাই কার্য্য অলক্ষে অবিরামে চলিয়াছে।

ভারতে অজন্তা গুহা

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষও প্রকৃতিদেবীর অনুকরণে বড় বড় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে মানুষ যখন বর্ত্তমান যুগের শক্তিশালী নানা যন্ত্র কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তখন একটি পাহাড়ের গুহাগাত্র খুদিয়া ভারতের অজন্তা গুহায় যে অত্যদ্ভুত কীর্ত্তি মানুষ রাখিয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা মেলা ভার। প্রকৃতিকেও এ বিষয়ে মানুষ টেক্কা দিয়াছে। প্রকৃতি অন্ধ, তাহার অনুচরবর্গ বিশাল

শক্তিশালী বটে, কিন্তু উহাদিগের শক্তি অসংযত। ফলে, ভাঙ্গিতে গিয়া যেটুকু মাত্র গড়িয়া উঠে; কিছু গড়ার উদ্দেশ্যে উহারা ভাঙ্গে না। মানুষ কিন্তু বুদ্ধিমান ও সচেতন; তাহার শক্তি সংযত.; সে গড়ার উদ্দেশ্য লইয়াই ভাঙ্গে।

মিশরের স্ফিনক্স (Sphinx)

প্রাচীনকালের এইরূপ মানুষের কীর্ত্তি স্বরূপ মিশরের দৈত্যমুর্ত্তির (Sphinx) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মুর্ত্তিটি একটী ক্ষুদ্র পাহাড়

স্ফিনক্স

কাটিয়া প্রস্তুত। ইহার মুখটি মানুষের, কিন্তু দেহটি সিংহের। উচ্চতায় ভুমি হইতে মাথা পর্য্যন্ত ৬৬ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে সিংহের সম্মুখের পদদ্বয় হইতে লাঙ্গুলের শেষ পর্য্যন্ত দুইশত ফুটেরও অধিক। ইহার মুখটি দৈর্ঘ্যে ৩৩ ফুট ও প্রস্থে ৭॥ ফুট, ইহার নাক ৫॥ ও কান দুটী ৫ ফুট দীর্ঘ। এতদিন ইহার অধিকাংশ বালির স্তুপে পোঁতা ছিল। এই বালির পাহাড় সরাইয়া সম্পুর্ণ দৈত্যমুর্ত্তিটি লোকচক্ষুর গোচর করিতে ৮০০ শত মজুরকে ছয় মাস ধরিয়া খাটিতে হইয়াছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পিত কীর্ত্তি

দক্ষিণ ডাকোটায় (Dakota) ৮০০ শত ফুট উচ্চ ও ৩,০০০ ফুট দীর্ঘ একটি ছোট পাহাড় (Mount Rushmore) আছে। ইহার একটি অংশ একেবারে খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। এই খাড়া অংশটীর ক্ষেত্রফল প্রায় ২০০ বিঘা। এই পাহাড়টি চুণে পাথর বা বেলে পাথরের নয়, অতি কঠিন গ্রানাইট পাথরে গড়া। এই পাহাড়ের খাড়া পাশটীকে কাটিয়া ভাস্কর Gut zon Borglum আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাত চারিজন রাষ্ট্রপতির মুখ খুদিতেছেন।

রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটনের মুখ

ওয়াশিংটন, জ্যাফারশন, লিঙ্কন ও রুজভেল্ট—এই চারিজন রাষ্ট্রপতির মুখের পাশে রাষ্ট্রপতি কুলিজ (Coolidge) কর্ত্তৃক ৫০০ শত শব্দে লিখিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইতিবৃত্ত খোদাই করা হইবে। ইহার প্রতি অক্ষরটি তিন ফুট উচ্চ হইবে এবং তিন মাইল দূর হইতে স্পষ্ট পড়িতে পারা যাইবে।

কয়েক বৎসর ধরিয়া খাটিলে মানুষের এই অক্ষয়কীর্ত্তিকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারা যাইবে। বায়ুচালিত ছিদ্র করিবার যন্ত্রের দ্বারা ফুটা করিয়া ডিনামাইট দিয়া ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা উড়াইয়া দিয়া মূর্ত্তিগুলি খোদাই হইতেছে। বর্ত্তমানের যন্ত্রযুগের অত্যন্ত উন্নত যন্ত্রের সহিত পুরাকালের সামান্য যন্ত্রের বিষয় তুলনা করিলে, তখনকার দিনে মানুষকে দৈত্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে কতদিন কতই না পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল !

কলের কোদালি

আজকাল মানুষকে যেরূপ বড় বড় কাজ করিতে হয়, তাহা তাহার ছোট ছোট হাত দুখানি দিয়া করা সম্ভব নহে ; সেইজন্য সে নানারূপ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে।

পানামা খাল খনন করিতে যতখানি মাটি ও পাথর কাটিতে হইয়াছিল তাহা সনাতন গাঁইতি ও কোদালি দিয়া কাটিলে কোন দিনই ঐ খাল কাটা সম্ভবপর হইত না। আজকাল এইরূপ খাল কাটিবার জন্য বাষ্পচালিত কলের কোদালি ব্যবহার করা হয়।

এই কোদালি এক কোপে একশত টন (প্রায় ২,৭০০ মণ) মাটি, পাথরের টুকরা, কাটা কয়লা ইত্যাদি চাঁচিয়া ৮৫ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিতে পারে। যে কোদালিতে একখানি মোটরগাড়ী সহজেই স্থান পায়, তাহার বিশাল রূপ সহজেই অনুমেয়।

জাহাজে কয়লা বোঝাই করিবার সময় আমেরিকায় আজকাল এইরূপ কোদালি ব্যবহার করা হয়। এইরূপ কোদালি চালাইতে দুইটী মাত্র লোকের প্রয়োজন হয়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে এইরূপ

শত শত কৌশল আয়ত্ত করিলে কি হইবে, ইহাতে কিন্তু শত শত লোক বেকার হইয়া পড়িতেছে।

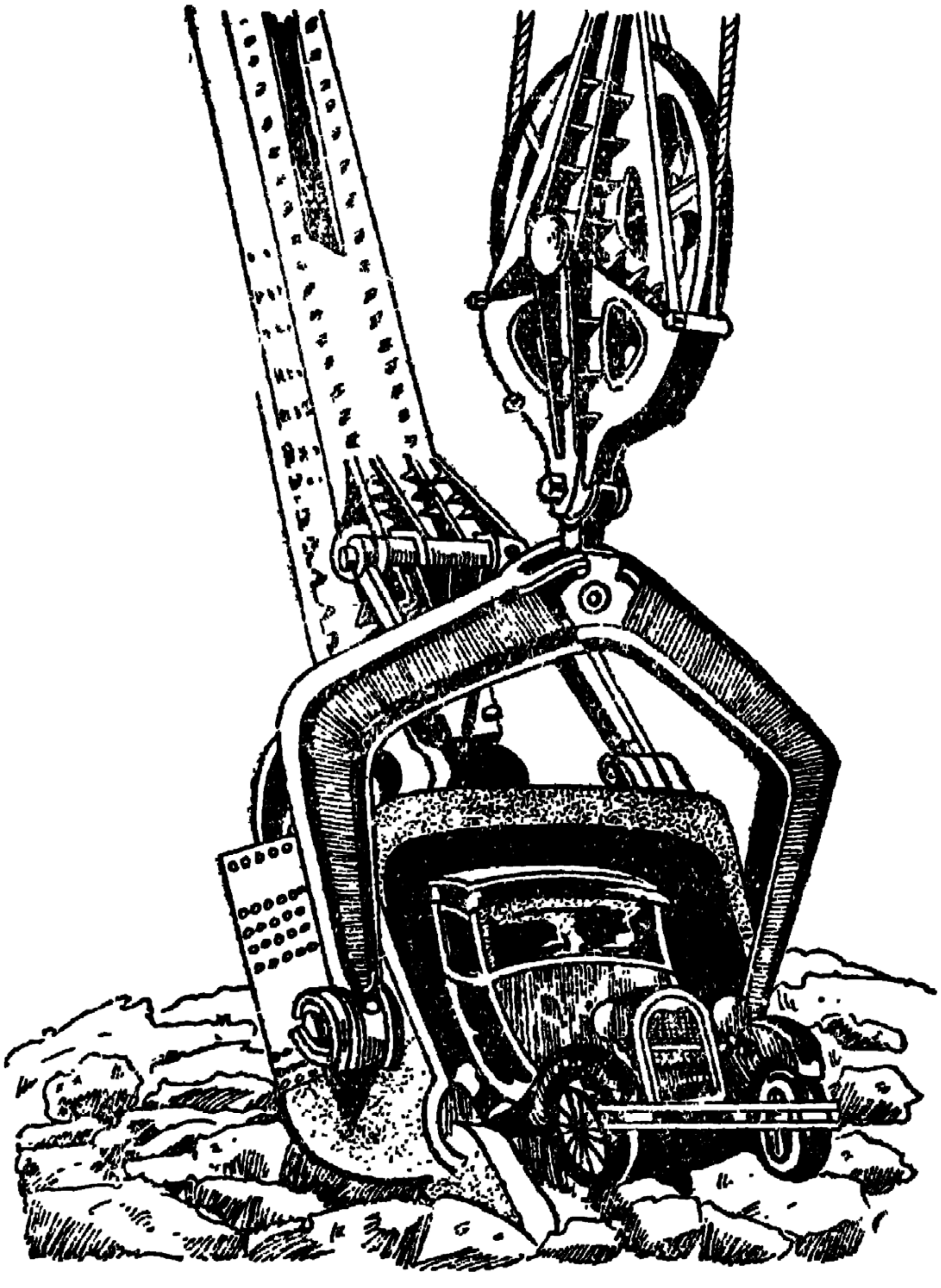

কলের কোদালিতে একখানি মোটর গাড়ী

জার্ম্মাণীতে মাটির নীচে ইলেকট্রিকের তার লইয়া যাইবার জন্য খানা কাটিতে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী কলের কোদালি ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা ঘণ্টায় ৩॥০ ফুট গভীর ও ৩০০ ফুট দীর্ঘ খানা কাটিতে পারে।

এই কোদালিটিকে ট্রাক্টারের (Tractor) সাহায্যে টানিয়া আগুপিছু চালাইতে পারা যায়।

অপরিসর ও অগভীর জলপথ খুঁড়িবার জন্য যে ড্রেজার (কলের কোদালি) ব্যবহৃত হয়, উহা একসারি, পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, ইস্পাতের বালতির একটি মালার মত দেখিতে। বালতিগুলির কানা কোদালির মত ধারাল। এই মাটিকাটা বালতির মালাটির প্রতি বালতিটি ধীরে ধীরে জলের নীচে গিয়া জাহাজের তলদেশের মাটি কাটিয়া লইয়া উপরে উঠে এবং কাটা মাটি, পাঁক কাঁকর ইত্যাদি তুলিয়া আনিয়া মোটা নলের মুখে জলপথের দুই তীরে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেয়।

এইরূপে জাহাজটি জলের উপরে থাকিয়া ধারাল বালতির কানা (Brim) দিয়া জলপথের গর্ভদেশের মাটি চাঁচিয়া উহাকে গভীর ও বড় জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত করে।

সম্প্রতি ইয়োরোপের এক বড় সহরের জল নিকাশের একটী বৃহৎ পয়ঃনালী খনন করিবার জন্য একটী কলের কোদালি ব্যবহার করা হইয়াছে। উহা একা এক হাজার শ্রমিকের কাজ করিতে পারে। ঐ দেশে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অত্যধিক, ফলে মজুরি দিয়া কোন বড় কাজ করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য সেখানে যন্ত্র দিয়া কাজ করিবার চেষ্টা এত অধিক।

আর এক কথা। পানামা খালের মত খুব বড় কাজ মানুষের হাতে কাটিয়া কোন দিন শেষ হইত না। পানামা খাল কাটিতে ৪০ কোটী টন মাটি, পাথর, কাঁকর কাটিতে হইয়াছিল এবং দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। পানামা খালপথে কুলেব্রা নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় পড়ে। উহাকে বিস্ফোরক পদার্থ দিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। এই স্থান হইতে প্রতি দিন ১০০,০০০ টন পাথরের টুকরা সরাইয়া ফেলিবার

জন্য মানুষের ক্ষুদ্র হাতের ছোট কোদালি দিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিয়া ও মাথায় বহিয়া এই বিশাল পাথরের টুকরার স্তূপ কোনদি-কি সরাইতে পারা যাইত, না কাটিতে পারা যাইত? সেইজন্য এই খাল-পথ কাটিতে ৯৮টি কলের কোদালি ব্যবহার করা হইয়াছিল। এইরূপ

দ্বিখণ্ডিত কুলেব্রা দিয়া পানামা খাল-পথ

কোদালির এক কোপে ৫।১০ টন মাটি, কাঁকর উঠে। এই যন্ত্রদানবগুলি সাহায্যে মানুষ পাহাড় কাটিয়া, চাঁচিয়া, গাড়ী বোঝাই করিয়া খালের পথ করিতে পারিয়াছে। আমাদের দেশেও দামোদর নদের উপত্যকায় কয়েকটি বাঁধ দিবার জন্য এবং বড় বড় খাল কাটিবার জন্য কলের কোদালির মত নানা রকমের যন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে।

নদীর তলদেশ হইতে পুলের ভিত্তি গাঁথিয়া তোলা

নদীর যেস্থানে পুল বাঁধা হইবে, সেই স্থানে কতখানি গভীর জল প্রথমেই তাহা নিরূপণ করা হয়। তাহার পর নদীর পার্শ্বে কোন স্থানে গর্ত্ত কাটিয়া দেখা হয় যে কতখানি গভীর করিয়া খুঁড়িলে শক্ত মাটি বা পাথরের স্তর পাওয়া যায়। পুলের বিশাল স্তম্ভগুলি শক্ত মাটির বা প্রস্তরের স্তরের উপর না দাঁড়াইতে পাইলে, নিজের ভারে মাটির মধ্যে বসিয়া পড়িবে ও পুলটি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এইরূপে শক্ত মাটি বা প্রস্তর স্তর হইতে কতখানি উচ্চ স্তম্ভ গাঁথিলে জলের মাথার উপর গিয়া পৌছিবে তাহা জানিয়া লওয়া হয়।

ইস্পাতের কূপের পরিচয়

উক্ত স্তম্ভের মত একটি দীর্ঘ ইস্পাত নির্ম্মিত কূপ (caisson) প্রস্তুত করা হয়। এই কূপ কয়েকটি কুঠরীতে বিভক্ত। ১৭ পৃষ্ঠায় ছবি দেখ।

ছবিতে ১ চিহ্নিত যে নলটি দেখা যাইতেছে, উহা দিয়া জাহাজ হইতে ঘনীভূত বায়ু কূপের গর্ভদেশস্থ যে কুঠরীটিতে মজুরেরা মাটি কাটে (৬ চিহ্নিত) তথায় পাঠান হয়। ঐ কুঠরী একবারে অন্ধকূপ বলিলেই হয়, সেইজন্য তথায় তীব্র ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর ব্যবস্থা করিতে হয়। ছবিতে ৭ চিহ্নিত স্থান নদীর তলদেশে কাদার তলায় পাথরের বা শক্ত মাটির স্তর। কূপের ইস্পাতের তলদেশ অতিশয় ধারাল। মজুরেরা কাদা কাটিয়া লইলে উহা নিজের ভারে ক্রমশঃ বসিতে থাকে এবং শেষে পাথরের স্তরের উপর গিয়া দাঁড়ায়। ৪ চিহ্নিত কুঠরীর কতকাংশ সিমেণ্ট ও

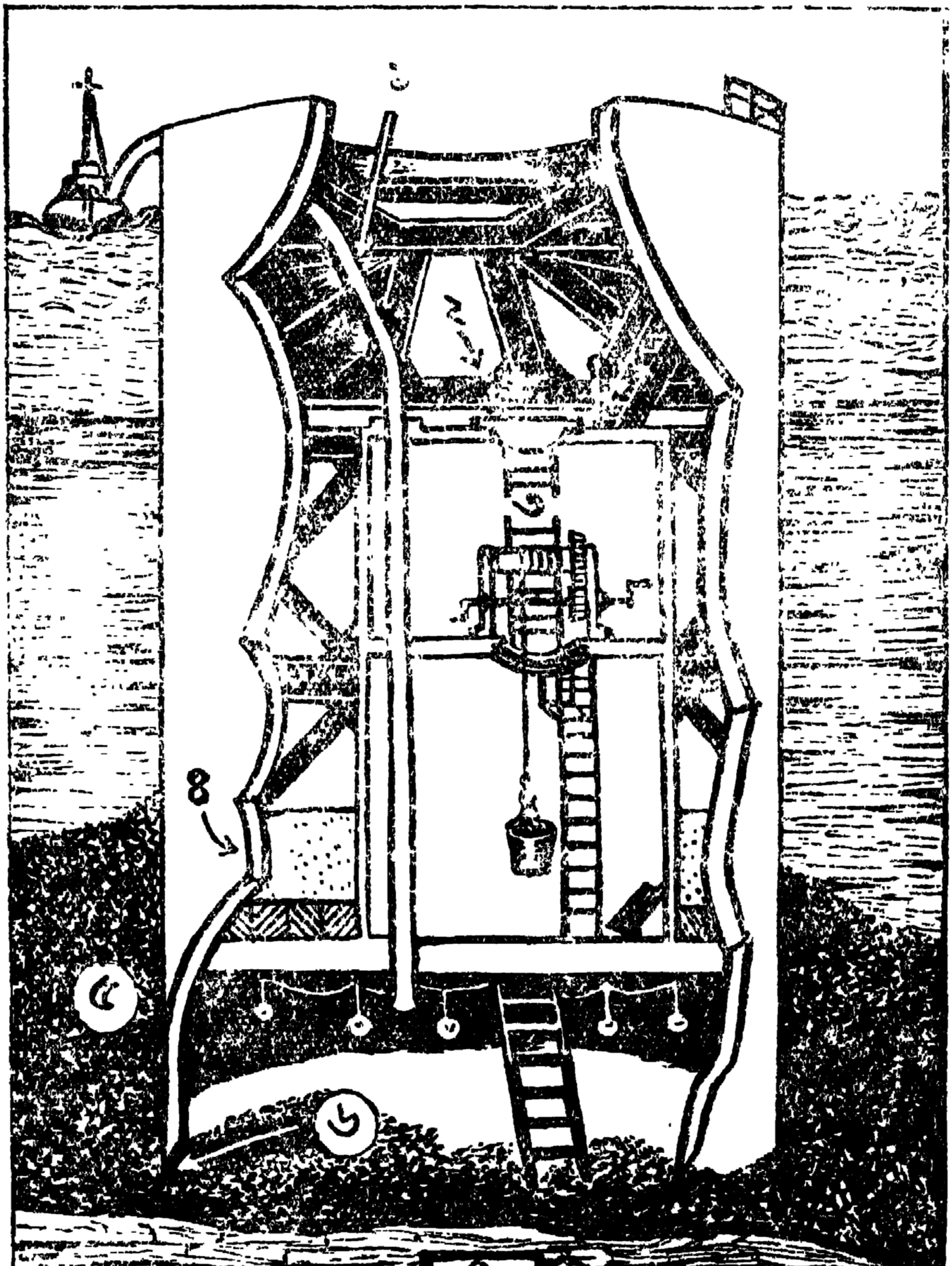

ইস্পাতের কূপ—Caisson

পাথরের কুচি দিয়া কংক্রীট (concrete) করিয়া, ইস্পাতের কূপটি যাহাতে জলের টানে ভাসিয়া না যায় সেইরূপ ভারী করা হয়।

নদীর তলে মাটি কাটা

কারখানায় এইরূপ একটি দীর্ঘ ও ভারী কূপ প্রস্তুত করিয়া জাহাজে করিয়া নদীতে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার পর ক্রেণের সাহায্যে উহাকে, নদীগর্ভে খাড়াখাড়ি ভাবে নামাইয়া, কাদার উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়। কূপের তলদেশস্থ কুঠরীতে যাহাতে নদীর জল প্রবেশ করিয়া না পড়ে সেইজন্য উপরিস্থিত জাহাজ হইতে ১ চিহ্নিত নল দিয়া বিশাল চাপে বায়ু পাম্প করিতে থাকা হয়। এই ঘনীভূত বায়ুরাশির চাপে নদীর জল ঐ কুঠরীতে প্রবেশ করিতে পারে না।

এইরূপ অত্যধিক বায়ুর চাপে কাজ করায় মজুরদিগকে অভ্যস্ত করিবার জন্য ৩ চিহ্নিত কুঠরীতে উহাদিগকে অধিক চাপে নিশ্বাস লওয়ান ক্রমশঃ অভ্যাস করান হয়। ২ চিহ্নিত কুঠরী কূপের সর্ব্বোপরি কুঠরী। ২ হইতে ৩ চিহ্নিত কুঠরীতে যাইবার পথ এক কৌশল যুক্ত লোহার কপাট (valve) দিয়া বন্ধ থাকে। ঐ কপাট ঠেলিয়া নামিয়া গেলে ৩ চিহ্নিত কুঠরীর অত্যধিক বায়ুর চাপে উহা আপনি বন্ধ হইয়া যায়।

নদীতলস্ত কাদার স্তর ৫ চিহ্নিত করিয়া দেখান হইয়াছে। কূপ মধ্যস্থ এই কাদার স্তর কাটিয়া লইলে ভারী ইস্পাতের কূপটি শক্ত মাটি বা পাথরের উপর গিয়া দাঁড়ায়। পাথরের উপর দাঁড়াইতে পাওয়ায় ইহাকে পাথরের কুচি, লোহা ও সিমেণ্ট দিয়া ভারী জমাট পাথরে পরিণত করিলেও আপনার ভারে আর কিছুতেই মাটি কাটিয়া বসিতে পায় না। এইরূপে কতকগুলি সমদূরে অবস্থিত পাথরের অপেক্ষাও শক্ত স্তম্ভ গাঁথিয়া তুলিয়া উহাদিগের উপর পুলের লোহার কাঠামটী নির্ম্মাণ করা হয়।

নদীতে বাঁধ

(১) নীল নদ

মিশর-ভূমি

পিরামিডের জন্মস্থান, অমিত বিক্রম ফারও নৃপতিদিগের কাহিনী বিজড়িত বিশাল মরুভূমিরাজ্য মিশর নীল নদের সৃষ্টি বলিলেও চলে।

মধ্য আফ্রিকার পার্ব্বতীয় হ্রদগুলির জল বর্ষায় কূল ছাপাইয়া নানা ধারায় বাহির হইয়া মিশরের মধ্য দিয়া সমুদ্রবক্ষে ফিরিয়া যাইবার জন্য যে পথে ছুটে, সেই পথকেই আমরা নীল নদ বলিয়া জানি। এই পথ প্রায় ৪,০০০ মাইল দীর্ঘ। এই পথের প্রথমাংশ অনুর্ব্বর পর্ব্বত মালার বক্ষ ভেদ করিয়া গিয়াছে, তাহার পর দ্বিখণ্ডিত পর্ব্বতাংশ দুইটি ক্রমশঃ তীর হইতে সরিয়া যাওয়ায় নদীর উভয় কূলের কয়েক মাইল মাত্র উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে একশত মাইল দূরে এই নদী দুইটি ভিন্ন পথে সমুদ্রে গিয়া পড়ায় একটি 'ব'দ্বীপ গড়িয়া উঠিয়াছে।

সমুদ্র হইতে আশুয়ান পর্য্যন্ত ৭০০ মাইল ভূমিই প্রকৃত মিশর। তাহার দক্ষিণের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সুদান বলিয়া পরিচিত। বর্ষায় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া নীল নদ যে উর্ব্বর মৃত্তিকারাশি অনুর্ব্বর মরুভূমিতে রাখিয়া যায়, তাহাই মরা মরুবক্ষে প্রাণ আনে। দেশে বৃষ্টি হয় না, অতএব নদীর জল বাড়িয়া দুকূল ছাপাইয়া পর্ব্বত হইতে আনীত প্রাণ স্বরূপ মৃত্তিকা দিয়া ঢাকিয়া দেয়। আবার বর্ষার শেষে নদী নিজ পুরাতন সীমাবদ্ধ পথে ফিরিয়া গেলে দেশে চাষ আরম্ভ হয়। মিশরে বর্ষাকাল নাই; তবে বন্যাকাল আছে; তাহার আয়ু জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত।

তাহার পর নদীর জল কমিতে থাকে, তখন নদীর ধারে ধারে চাষ আরম্ভ হয়। এই সময় উত্তর দিক হইতে শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ করায় দেশে মধুর শীত অনুভূত হয়। এই ঋতুকে শীতকাল বলা চলে। ইহার আয়ুষ্কাল নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত। এই সময় পৃথিবীর নানাদেশ হইতে যাত্রীগণ এই দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে আসেন।

তাহার পর গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইলেই শস্য পাকিতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ সূর্য্যের তাপ বাড়িতে থাকে। পাহাড় ও মরুভূমির বিশাল বালুকা-রাশি তাতিয়া উঠিলে মনে হয়, সারা দেশটাই একটি বিরাট চুল্লিতে পরিণত হইয়াছে। দিনে মিশরবাসীগণ বাহির হইতে পারে না, তাহার উপর দক্ষিণ হইতে ঝড় উঠিলে আর রক্ষা নাই। উত্তপ্ত ঝড়ের মুখে বালির পাহাড় উড়িয়া আসিয়া সারাদেশ, বাড়ী, ঘর, দুয়ার, আসবাবপত্র, সকল দ্রব্যই বালুকায় ঢাকিয়া দিয়া যায়। ঝড় থামিলেও জ্বালাকর তাপ কমে না। এই সময় আমাদের দেশের দামোদর নদের মত, বিরাট নীল নদের বক্ষে বালির চড়া ভাসিয়া উঠে এবং নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। এই ঋতুকালের আয়ু মার্চ্চ হইতে জুন পর্য্যন্ত।

বাঁধের কল্পনা

বর্ষায় যে প্রচুর জলধারা নদীপথে নামিয়া সমুদ্রে গিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে উহা ধরিয়া রাখিতে পারিলে সারা বৎসরই চাষ আবাদ চলিতে পারে, এ কথা প্রাচীন কাল হইতেই মানুষের মনে জাগিত, কিন্তু বর্ষার নীলনদের দুর্দ্দান্ত রূপ দেখিয়া বাঁধ দেওয়া সম্ভব বলিয়া কোন কালে তাহার মনে হয় নাই। বর্ত্তমান যন্ত্রযুগে মানুষ দুর্দ্দান্ত নদে বাঁধ দিয়া উহাকে বশে আনিয়াছে।

বর্ত্তমানে নীলনদের চারিস্থানে আড়াআড়ি বিশাল বাঁধ দিয়া বাঁধা হইয়াছে। প্রথম কায়রোর নিকটেই 'ব' দ্বীপের মুখে জিফ্‌টার (Zifta), দ্বিতীয়টি আশুইট্‌-এ তৃতীয়টি এসনেতে ও বৃহত্তমটি আস্যুয়ানে।

প্রথম বাঁধ

'ব' দ্বীপের মুখের বাঁধটি ফরাসী কারিগরেরা আরম্ভ করেন। বাঁধটি সম্পূর্ণ হইবার পর, উহা বর্ষার বিশাল জলরাশি ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবামাত্র দেখা গেল জলের বিশাল চাপে বাঁধটি কয়েক স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে ; আরও দিন কতক পরে দেখা গেল যে, জলের বিষম ঠেলায় সম্পূর্ণ বাঁধটি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে !

কোটী কোটী টাকায় নির্ম্মিত বিশাল বাঁধটি রক্ষা করিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া, মিশরাধিপতি মহম্মদ আলি প্রজাকুলকে বাঁচাইবার জন্য বাঁধটি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলাও মুখের কথা নয়, হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রায় ৭,৫০০,০০০ টাকা লাগিবে।

এই সময় স্যার কলিন মনক্রীফ্ (Sir Collin Moncrieff) ও বিখ্যাত সেচ্ বিদ্যাপটু স্যার উইলিয়ম উইলকক্স (Sir William Willcocks) বলিলেন যে তাঁহারা ঐ ব্যয়ে বাঁধটি সুদৃঢ় করিয়া দিবেন। মিশরাধিপতি তাঁহাদিগের উপর এই কার্য্যের ভার দিলেন। তাঁহাদিগের কৌশলে বাঁধটি রক্ষা পাইল। এই বাঁধের ফলে ৫০ লক্ষ বিঘারও অধিক জমিতে সারা বৎসর সেচের ব্যবস্থা হইল।

দ্বিতীয় বাঁধ

কায়রো হইতে ২৫০ মাইল দক্ষিণে আশুইট্ (Assuit), দক্ষিণ মিশরের প্রধান নগর। এই স্থানে অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ নীলনদের দ্বিতীয় বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধে বর্ষার জল ধরিয়া রাখায় প্রায় দেড় কোটী বিঘা জমিতে সারা বৎসর সেচ সম্ভব হইয়াছে।

তৃতীয় বাঁধ

ইহার আরও ২৪০ মাইল দক্ষিণে এস্নে (Esneh) বাঁধ। নীল

নদের বর্ষার উদ্দাম প্লাবন সংযত করিবার উদ্দেশ্যে এই বাঁধটী দেওয়া হইয়াছে। তাহার আরও ১১০ মাইল পরে ভূমধ্যসাগর হইতে প্রায় ৭৫০ মাইল দূরে প্রথম খাড়ির মুখে আসুয়ান বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে।

চতুর্থ বাঁধ

এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আসুয়ান বাঁধ দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার হইয়াছিল। এইস্থানে নীলনদ তিনদিকে গ্রানাইট পাহাড়ে বেষ্টিত এবং পাহাড়ের কোলে কোলে নদ বহিয়া চলায় বাঁধের ভিত্তি গাঁথিবার জন্য আর নদীগর্ভে খুঁড়িতে হয় নাই। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে নদ পাঁচটী বিভিন্ন খাড়ি পথে ঘণ্টায় ১৬ মাইল বেগে ছুটিতেছে, ফলে উহার ভয়ঙ্কর রূপ ও গর্জ্জন প্রায় নায়াগ্রা জলপ্রপাতেরই অনুরূপ।

বাঁধটি দিবার পূর্ব্বে নিকটস্থ মরুভূমিতে ২০,০০০ মজুত ও ওস্তাদ কারিগরের বাস করিবার উপযুক্ত একটি নগর স্থাপন করিতে হইল। উহাতে একটি বড় হাঁসপাতাল, পোষ্ট অফিস, বাজার ইত্যাদি নগরের যাবতীয় সুখ-সুবিধা ব্যবস্থা করিতে হইল।

গ্রীষ্মকালে মরুভূমির উত্তাপে কাজ করিতে করিতে সর্দ্দিগর্ম্মিতে মানুষ মারা পড়িতে পারে, সেইজন্য উহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইল। সর্দ্দিগর্ম্মির প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিকটে নিকটে বহু তাঁবু খাটান হইল। এই সকল তাঁবুতে স্নানাগার, প্রচুর বরফ ও ডাক্তার ডাকিবার জন্য টেলিফোনের ব্যবস্থা হইল। বাঁধ-নির্ম্মিতাদিগের অতি সতর্ক দৃষ্টির ফলে ঐরূপ প্রাণান্তকর গ্রীষ্মে কাজ করিয়াও একটি লোকও সর্দ্দিগর্ম্মিতে মরে নাই।

এইস্থানে বাঁধের পক্ষে বহু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রধান অন্তরায় ছিল অসম্ভব জলের তোড়। গ্রীষ্মকালে যখন নীল-নদের জল পাঁচটী ধারায় পাঁচটী গভীর খাতে প্রবাহিত হয়, তখনও জলের এত তোড় যে ৩৫০ মণ ভারী প্রস্তরখণ্ড উহাতে ফেলিয়া দিলে উহাকেও খড়

কুটার মত ভাসাইয়া লইয়া যায়। যখন কারিগরেরা দেখিলেন ঐরূপ বৃহৎ পাথরের টুকরাও জলের তোড়ে দাঁড়াইতে পারিতেছে না, তখন তাঁহারা মালগাড়ীতে ঐরূপ কয়েকটী ভারী পাথরের টুক্‌রা তারের দড়ি দিয়া একত্রে বাঁধিয়া গাড়ীটাকে নদীতে ফেলিয়া দিতেন। এইরূপে বহু আয়াসে একটি ধারায় বড় বড় পাথরের টুক্‌রা ফেলিয়া ফেলিয়া অস্থায়ীভাবে উহার মুখ বন্ধ করা হইল। তাহার পর আর একটু দূরে ঐরূপ আর একটি অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হইল। এইবার দুইটি বাঁধের মাঝের জল পাম্প করিয়া তুলিয়া ফেলিয়া বর্ষাগমের পূর্ব্বেই ফেরো-কংক্রীটের দৃঢ় ভিত্তি গাঁথিয়া তোলা হইল। এই স্থায়ী ভিত্তির অগ্র ও পশ্চাতে অস্থায়ী বাঁধ থাকায় বর্ষার জলের প্রবল তোড়েও ভিত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

প্রতি গ্রীষ্মকালে এক একটি ধারায় এইরূপে দৃঢ় ফেরো-কংক্রীটের ভিত্তি গাঁতিয়া তোলা হইল। তাহার পর, এই ভিত্তির উপরে পাথর দিয়া বাঁধ গাঁথা খুব বেশী শক্ত নহে। এই বাঁধটি দৈর্ঘ্যে সওয়া মাইল, নদীগর্ভ হইতে মাথা পর্য্যন্ত উচ্চে ১২০ ফুট, পাদদেশে বাঁধটি ১০০ ফুট চওড়া ও উহা সরু হইতে হইতে শীর্ষদেশে গিয়া ২৪ ফুটে দাঁড়াইয়াছে। ইহার মাথায় একটি পথ নির্ম্মিত হওয়ায় হাঁটিয়াই নদী পারাপার হইতে পারা যায়।

ইহার গায়ে ১৮০টি নর্দ্দমা আছে, ঐগুলি প্রয়োজন হইলে লৌহদ্বারের সাহায্যে অনায়াসেই খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যায়। ঐগুলির মধ্যে ১৪০টি লৌহ-দ্বার (Lockgate) ২৩ ফুট লম্বা ও ৬।।০ ফুট চওড়া।

এই বাঁধটির নির্ম্মাণ কার্য্য ১৯০২ খৃঃ শেষ হয়। সারা বৎসর জল পাওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় জলের চাহিদা বাড়িয়াই চলিল। ফলে অধিক পরিমাণে জল ধরিয়া রাখিবার জন্য মিশরের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ বাঁধটিকে আরও ২৩ ফুট উচ্চ করিতে আদেশ দিলেন।

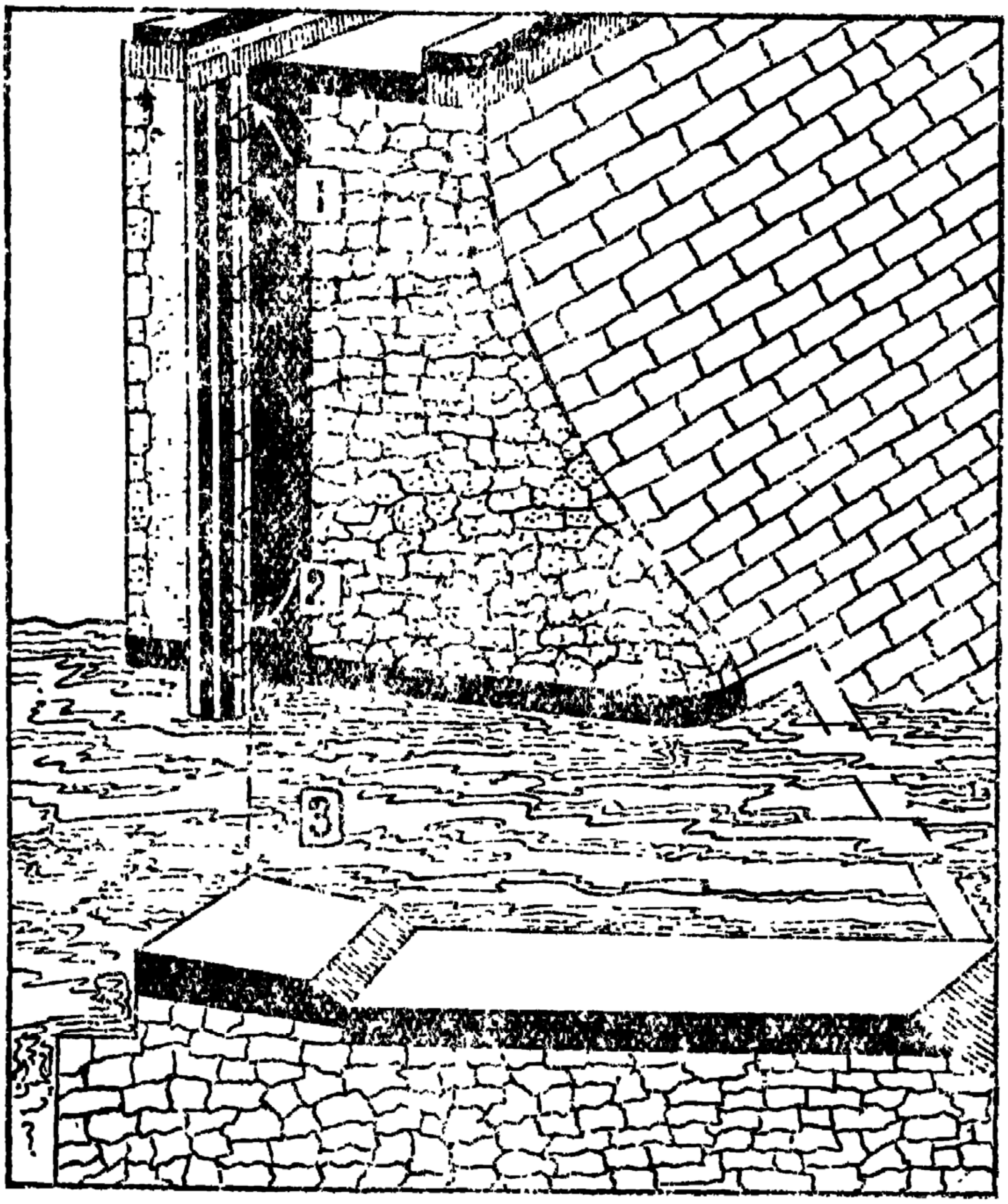

বাঁধের নর্দ্দামার পরিচয়—(১) দ্বারে রোলার থাকায় দ্বারটি অল্প আয়াসেই খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারা যায়। (২) লৌহ দ্বারটি তোলা হইয়াছে। (৩) ফলে নর্দ্দামা দিয়া নদের জল বেগে ছুটিয়া চলিবার পথ পাইয়াছে।

১৯০৭ খৃঃ এই নূতন কাজে হাত দেওয়া হয়, সহস্র সহস্র মজুর ও কারিগর ৫ বৎসর দিবারাত্র খাটিয়া ইহাকে আরও ২৩ ফুট উচ্চ করিতে সক্ষম হয়। বাঁধটি ২৩ ফুট উচ্চ করিলে পুর্ব্বের তুলনায় আড়াই গুণ জল ধরিবে, ফলে ধরা জলের বিশাল চাপও বহুগুণ বাড়িবে ; সেইজন্য বাঁধের মাথার উপর গাঁথিয়া উচ্চ করিলে বাঁধটি জলের বিশাল চাপে কালে ভাঙ্গিয়া

পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত। এই বিপদ এড়াইবার জন্য কারিগরেরা প্রথমেই পূর্ব্বের মত নদীগর্ভে বাঁধটির পাদদেশ পূর্ব্বাপেক্ষা চওড়া করিয়া গাঁথিয়া উহাকে দৃঢ়তর করিলেন। বাস্তবে বাঁধের প্রথম ভিত্তির পাশে আর একটি ভিত্তি গাঁথা হইল। পুরাতন ভিত্তিটি সাত বৎসরে জমিয়া বসিয়া নদীগর্ভস্থ পাথরের উপর আপনার স্থায়ী স্থান করিয়া লইয়াছিল। তাহার একেবারে গা ঘেঁসিয়া নূতন ভিত্তির উপরে পুরাতন বাঁধের মাথা পর্য্যন্ত গাঁথিয়া তুলিয়া তাহার পর উভয়ের উপরে যদি ২৩ ফুট নূতন গাঁথুনি দেওয়া হইত, তাহা হইলে কিছুদিন পরে এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইত।

নূতন ভিত্তিটি কয়েক বৎসরে ক্রমশঃ বসিয়া ও কাঁপিয়া একটা নূতন আকার গ্রহণ করিবে, ইহাই হইবে উহার স্থায়ী আকার; কিন্তু পুরাতন বাঁধটি পূর্ব্বেই স্থায়ী আকার গ্রহণ করায় উহার আর কোন পরিবর্ত্তনই হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ফলে মাথার ২৩ ফুট গাঁথুনির অর্দ্ধেক অংশ থাকিত স্থায়ী বাঁধের উপর এবং অপর অংশ থাকিত অস্থায়ী বাঁধের উপর। কালে অস্থায়ী বাঁধের আকারের পরিবর্ত্তন ঘটিলে মাথার নূতন গাঁথুনির ভিত্তি দুইটী অসমতল হওয়ায় চাড়ে ফাট ধরিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইত এবং কালে ভাঙ্গিয়া পড়িত। সেইজন্য কারিগরেরা নূতন ভিত্তি গাঁথিবার সময় এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন।

তাঁহারা পুরাতন বাঁধের গায়ে ছিদ্র করিয়া বহু লোহার কড়ির একপ্রান্ত গাঁথিয়া দিলেন। তাহার পর নূতন ভিত্তিটি দুই হইতে ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত সরাইয়া গাঁথিতে লাগিলেন এবং ঐ কড়িগুলির অন্য প্রান্ত এই নূতন গাঁথুনির সহিত আঁটিয়া দিলেন। পুরাতন ও নূতন বাঁধের মাঝে দুই হইতে ছয় ইঞ্চি ফাঁক রহিল এবং দুইটী বাঁধ অসংখ্য লোহার কড়ির বাঁধনে পরস্পর বাঁধা পড়িল।

তাহার পর কয়েক বৎসর পরে নূতন বাঁধটি পুরাতনের মত স্থায়ী

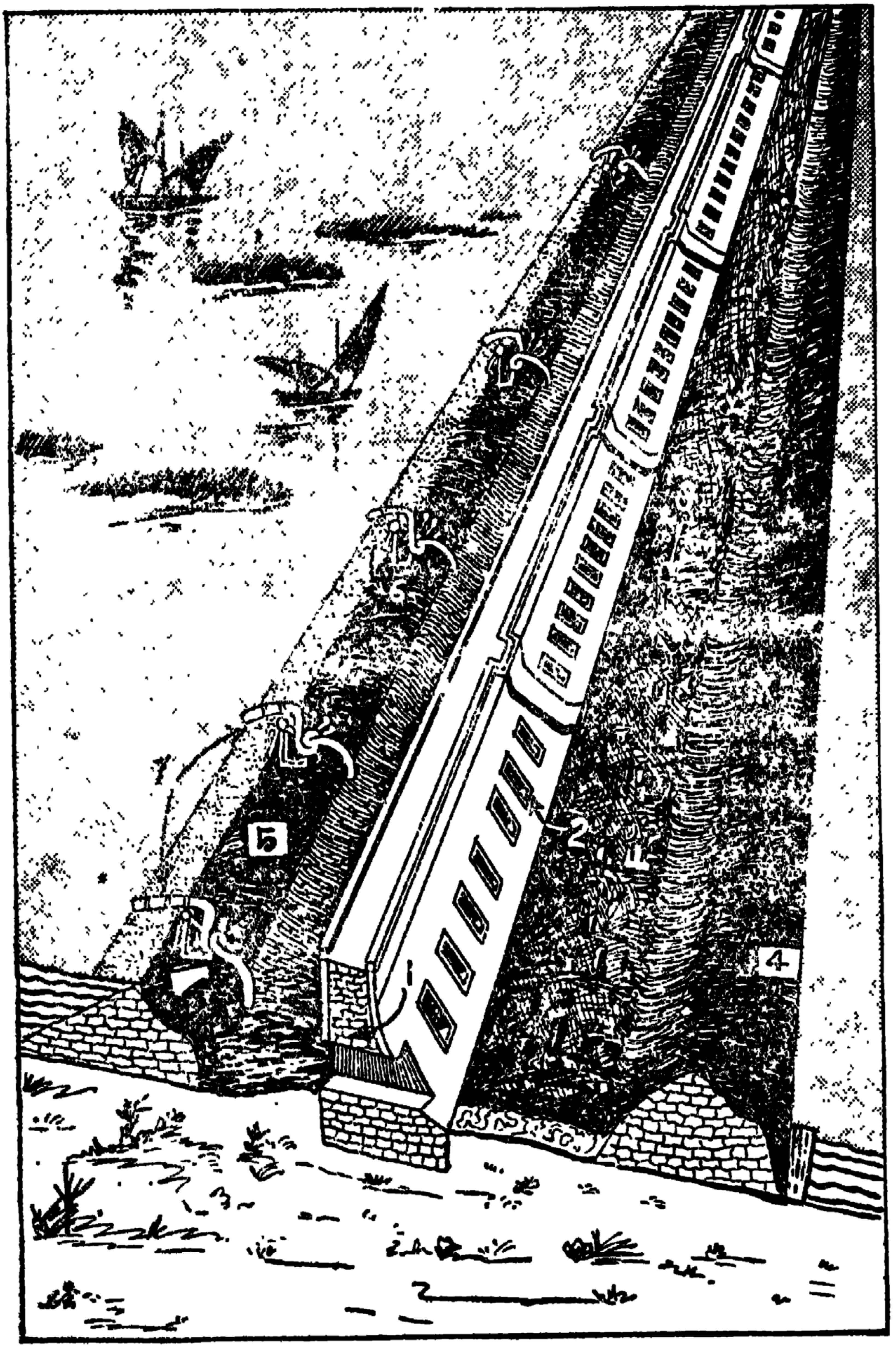

পুরাতন বাঁধের উপর নূতন বাঁধ দেওয়া হইতেছে

(১) পুরাতন বাঁধের অংশ। (২) বাঁধের নর্দ্দমা। (৩) ও (৬) নদের শুষ্ক তলদেশ। (৪) পাথরের অস্থায়ী বাঁধ। (৫) জল ছেঁচিয়া ফেলিবার জন্য পাম্প।

আকার ও আসন গ্রহণ করিলেও লোহার বাঁধনের মাঝে মাঝে কড়িগুলি বাঁকিয়া যাওয়া ছাড়া পুরাতন বাঁধটির আর কোন ক্ষতি হইল না। তাহার পর দুইটী বাঁধের মাঝের ফাঁক সিমেণ্ট ও পাথরকুচি দিয়া ভরাট করিয়া দেওয়া হইলে উহারা এক হইয়া গেল। এই সিমেণ্ট জমিয়া পাথর হইলে পর উভয়ের মাথার উপরে ২৩ ফুট নূতন গাঁথুনি তোলা হইল।

প্রথম বাঁধে একশত কোটী টন জল ধরিত; ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় বারে বাঁধটী ২৩ ফুট উচ্চ করায় ২৫০ কোটী টন জল ধরিল। ইহার ফলে এক কোটী বিঘা তৃষ্ণার্ত্ত মরুপ্রান্তর জল পাইয়া বাঁচিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁধটি পুনরায় ৩০ ফুট উচ্চ করা হইতেছিল, বোধ হয় এতদিনে কার্য্য শেষ হইয়া থাকিবে। তৃতীয়বার বাঁধটি উচ্চ করার ফলে ৪৮০ কোটী টন জল ধরিয়া রাখা চলিবে। এই নূতন বাঁধের ফলে ২৩০ মাইল দীর্ঘ এক হ্রদ সৃষ্টি হইয়াছে এবং নির্ম্মম সর্ব্বনাশকর মরুভূমির কবল হইতে ১ কোটী বিঘা নূতন জমি কাড়িয়া লইয়া প্রাণবন্ত করা হইয়াছে।

(২) সিন্ধুনদ

এই নদ ১৪,০০০ ফুট উচ্চে তিব্বতে জন্মিয়া হিমালয় পাহাড়ের কোলে কোলে বহিয়া কয়েকটী খাড়ি দিযা কাশ্মীর প্রদেশে উপস্থিত হয়। তাহার পর বুনজির (Bunji) নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে বাঁকে এবং পঞ্জাবের আটকের (Attock) নিকটে কাবুল হইতে আগত কাবুল নদীর জলধারার সহিত মিশে। পাঞ্জাবের কয়েকটি নদীর জল আসিয়া মিথানকোটে (Mithankote) সিন্ধুনদে পড়ে এবং তাহার পরই উহা সিন্ধুর সমতল ভূমিতে পড়িয়া আরব সাগর অভিমুখে ছুটিতে থাকে।

পাহাড়ে পাহাড়ে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া সিন্ধুনদ আটকে পৌছিলে উহাতে নৌকা চলাচল সম্ভবপর হয়। কিন্তু বর্ষাকালে নদের দুপাশে পূর্ব্বে ভীষণ প্লাবন দেখা দিত। বর্ষাকালে নদে ভীষণ বন্যা, অথচ অন্য সময় জলাভাবে উহার স্থানে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া

যায়। গ্রীষ্মকালে জলাভাবে হাহাকার উঠে এবং মাঠে তপ্ত বালির তুফান ছুটে। ফলে সিন্ধু প্রদেশের অধিকাংশ স্থান আজ মরুভূমি। বর্ষার বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলে গ্রীষ্মকালে জলের হাহাকার ঘুচে এবং শুষ্ক নিষ্করুণ তপ্ত মাঠগুলিকে শস্যশ্যামল সরস শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যে সিন্ধুনদে লয়েড বাঁধ দিয়া ইহার বন্যার জল ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সিন্ধুনদ দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল। সমস্ত সিন্ধুপ্রদেশ ও আংশিক পঞ্জাবের ৩৭২,০০০ বর্গমাইল ভূভাগের উপর যে বৃষ্টিপাত হয়, উহা সিন্ধুনদ বিয়াই সমুদ্রে গিয়া পড়ে। এক কথায় সিন্ধুনদ এই বিস্তৃত ভূভাগের নিকাশি ড্রেনের কাজ করে।

ভারতে দুর্ভিক্ষ

মোগল সম্রাজ্যের পতনের মুখে দেশে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হওয়ায় কেহই আর দেশের সেচ্ প্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখিবার অবসর পাইত না। ফলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত এবং লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যভাবে প্রাণ হারাইত।

১৮৭৪ খৃঃ (চুয়াত্তরের মন্বন্তর) বাংলাদেশে দশ লক্ষের অধিক লোক খাদ্যাভাবে মারা যায়। ১৮৭৭ খৃঃ সমগ্র ভারতের ঐরূপ দুর্দশা হয়। ১৮৯৬-৯৭ খৃঃ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস ভারতে ২,৫০০,০০০ অধিক লোক গ্রাস করে। ১৯০০খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে ত্রিশ লক্ষের অধিক লোক খাদ্যাভাবে মারা পড়ে এবং প্রায় নয় কোটী লোক না খাইয়া বা সামান্য কিছু খাইয়া বাঁচিয়াছিল।

ইংরাজ শাসন-কর্তৃপক্ষ দেশের এই ব্যাধির প্রতিকারকল্পে দুইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল :—

(১) একস্থানের প্রচুর শস্যসম্ভার আর এক অভাবগ্রস্ত স্থানে লইবার জন্য রেলপথের বিস্তার।

(২) বাংলা ও উড়িষ্যা ব্যতীত আর সকল প্রদেশে বড় বড় নদীতে বাঁধ দিয়া এক দিকে বন্যা হইতে প্রজাকুল রক্ষা করা এবং অন্য দিকে ধরা জলে সারাবৎসর চাষ আবাদ করা।

সিন্ধুনদের বাঁধ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৯ বৎসর লাগিয়াছে এবং বিশ কোটীর অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং ইহার গায়ে ৬৬টী জল ছাড়িবার দ্বার আছে। দ্বারগুলি লৌহনির্ম্মিত ও প্রত্যেকটি ৫০ টন ভারী। প্রতি দ্বারটি তিন শত টনের অধিক জলের চাপ সহ্য করিতে পারে। সিন্ধুনদের বন্যার বিশাল জলভার ধরিয়া রাখিয়া প্রয়োজন মত বহু খালে জল ছাড়া হয়। তৃষিত মরুবক্ষে জল লইয়া যাইবার জন্য বহু ছোট বড় খাল কাটিতে হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও যে ভূভাগ ভয়ঙ্কর মরুপ্রান্তর ছিল, আজ সে স্থানে ৬,১৬৬ মাইল খাল-পথে প্রাণপূর্ণ জল গিয়া প্রায় আড়াই কোটী বিঘা জমি প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। ফলে খালের দুই পাশে শত শত নূতন গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। বৎসরে সেখানে আজ প্রায় এক শত কোটী টাকা মূল্যের গম, যব, চাউল, তুলা ও আখ জন্মায়।

সিন্ধুদেশের মতন জনমানবহীন শ্বাদপসঙ্কুল মরুভূমিতে সকল জিনিষ বহিয়া লইয়া গিয়া অল্পে অল্পে লয়েড বাঁধের মত বিশাল গাঁথুনি গাঁথিয়া তোলায় যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় কারিগর দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

(৩) হুভার বাঁধ

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (U. S. A.) গ্রীন নদীর জন্ম য়োমিং (Wyoming) পাহাড়ে এবং গ্রাণ্ড নদীর জন্ম কোলোরাডো

পাহাড়ে; এই দুইটি নদীর মিলিত স্রোত কোলোরাডো নদী নামে পরিচিত। এই নদীটি ২২০০মাইল দীর্ঘ; কিন্তু ইহার মধ্যে হাজার মাইল ইহা পাহাড়ের কোলে কোলে পথ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পার্ব্বত্যপথে পথ কাটিতে গিয়া বহু গভীর গিরিখাত গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নদী শুষ্ক নিষ্করুণ মালভূমি দিয়া বহিয়া আরিজোনা (Arizona) প্রদেশের বিখ্যাত গিরিখাত, গ্রাণ্ড কেনিয়ন্ (Grand Canyon) ভেদ করিয়া গিয়াছে এবং তাহার পর ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্য দিয়া গিয়া ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে পড়িয়াছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রদেশস্থ ইম্পিরিয়াল উপত্যকা (Imperial Valley) উক্ত নদীর পথে পড়ে। এই স্থানে লক্ষাধিক লোকের বাস এবং বৎসরে প্রায় ২৫ কোটী মুদ্রারও অধিক মূল্যের ফসল জন্মে। এই ভূখণ্ড সমুদ্র পৃষ্ঠ অপেক্ষা নিম্নভূমি এবং নদীগর্ভ হইতেও ১০০ হইতে ৩৫০ ফুট পর্য্যন্ত নিম্নভূমি বলিয়া উল্লিখিত উচ্চ পাহাড়গুলিতে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলেই মহা বিপদ উপস্থিত। হয়। কোলোরাডো নদী হঠাৎ অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠিয়া সর্ব্বনাশকর রূপ গ্রহণ করে। তখন উর্ব্বর সম্পদশালী ইম্পিরিয়াল্ উপত্যকা রক্ষা করা এক মহা সমস্যা হইয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে ঐ প্রদেশ ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

নদী হঠাৎ কিরূপ দুর্দ্দান্ত ও সর্ব্বনাশা হইয়া উঠে, তাহার দুই একটী ঘটনা এই স্থানে বলিয়া রাখি। ১৯০৫ খৃঃ পাহাড়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় পার্ব্বত্য-প্রদেশে নদী দুকূল ছাপাইয়া উঠিল। ফলে বন্যার ভীষণ স্রোতে নদী নূতন পথে মরুভূমি দিয়া ৭০ মাইল গভীর খাত কাটিয়া সাল্টন (Sulton) সমুদ্রে গিয়া মিশিল, এই অতিরিক্ত জলরাশি পাইবার ফলে উক্ত হ্রদের জল ছাপাইয়া উঠিয়া চারিদিকের দশ লক্ষ বিঘা ভূমি গ্রাস করিল।

তাহার পর ১৯২২ খৃঃ জুন মাসে নদীর বন্যায় পালো ভার্দে (Palo Verde) উপত্যকার অর্দ্ধেক ভাগ গ্রাস করে। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই ডুবিয়া নষ্ট হইল এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন হইল।

এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে কোলোরাডো নদীকে বাঁধিয়া বশে আনা দরকার। এই অতিশয় ব্যয়সাধ্য কার্য্যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ হাত দিয়াছেন। এই অসম্ভব কাজ শেষ করিতে প্রায় শতাধিক কোটী টাকা ব্যয় হইবে। এই বাঁধই হুভার বাঁধ নামে পরিচিত।

হুভার বাঁধ সম্পূর্ণ হইলে ইম্পিরিয়াল্ ও কোচিলা (Coachilla) উপত্যকা দুইটী বন্যার গ্রাস হইতে বাঁচিবে এবং ৬০ লক্ষ বিঘা অনুর্ব্বর মরুভুমি উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হইবে। উচ্চ ভূমিতে ধরা জল সংযত জলপ্রপাতরূপে নামিয়া আসিবার কালে ডায়নামো চালাইয়া ১৮ লক্ষ অশ্বশক্তি তুল্য বিদ্যুৎশক্তি উপাদান করান চলিবে। তাহার উপর ঐ বাঁধ হইতে জল পাইয়া ক্যালি-ফোর্নিয়ার দক্ষিণাংশের নগরগুলির বহু দিনের পানীয় জলের অভাব মিটিবে।

ওস্তাদ্ কারিগরেরা লাস্ ভেগাস্ (Las Vegas) হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ব্ল্যাক কেনিয়ন গিরিখাতে বাঁধ দিতেছেন। এই স্থানে গিরিখাত অর্দ্ধ মাইল গভীর এবং নদী এই পথে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই স্থানে বাঁধ দিলে নদীকে চিরতরে শান্ত করিতে পারা যাইবে, এই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।

বাঁধের কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মজুর ও কারিগরের থাকিবার জন্য বাঁধের ছয় মাইল দূরে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বুলডার নগর নামক একটি উপনিবেশ গঠন করা হইয়াছে। এই নগরে (Boulder City) ২৫০০ মজুর ও কারিগরের সকল সুখ-সুবিধার

জন্য গির্জ্জা, দোকান, ব্যাঙ্ক, স্কুল, কলেজ, জলের কল, ইলেকট্রিক লাইট, মায় সিনেমার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা আছে।

নদীর দুইপাশে অর্দ্ধমাইল উচ্চ খাড়া পাহাড়। এই স্থানে নদীর ক্ষুরধার বেগকে প্রশমিত করিতে না পারিলে বাঁধ দেওয়া অসম্ভব। এইজন্য কারিগরেরা প্রথমেই উভয়দিকে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি সুড়ঙ্গ কাটিতেছেন। সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে চারিটীর ব্যাস হইবে ৫০ ফুট, ৪৮টীর ব্যাস ৮॥০ হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত এবং উহারা দৈর্ঘ্যে হইবে তিন মাইল। যে স্থানে বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে, ঐস্থান হইতে কিছু আগে সুড়ঙ্গগুলির একটি মুখ ও কিছু পশ্চাতে অপর মুখটি থাকিবে।

সুড়ঙ্গগুলির কাটা হইবার পর গ্রীষ্মকালে ক্ষীণকায়া নদীপথে পাথর ও মাটি দিয়া অস্থায়ী বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে; তখন উক্ত সুড়ঙ্গ-গুলির নূতন পথে নদীর জল প্রবেশ করিয়া বাঁধের নির্দ্দিষ্ট স্থানটীকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া আবার নিজ পথে বহিয়া চলিবে। ইহা ব্যতীত বর্ষাকালের অতিরিক্ত জল পাছে উক্ত ৫২টী সুড়ঙ্গপথে বাহির হইতে না পারিয়া অস্থায়ী বাঁধটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বাঁধের নির্ম্মাণকার্য্যে বাধা জন্মায়, সেইজন্য পাহাড়ের কোলে কোলে বাঁধ দিয়া ১১টী বড় হ্রদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

দিবারাত্র ধরিয়া সুড়ঙ্গ কাটা চলিতেছে এবং গড়ে দিনে ২৫০ ফুট দীর্ঘ সুড়ঙ্গ কাটা হইতেছে। সুড়ঙ্গগুলি কাটিতে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

তাহার পর বাঁধের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে। বাঁধটী ফেরো-কংক্রীটে নির্ম্মিত হইবে। সম্পূর্ণ বাঁধটি উচ্চে ৭৩০ ফুট এবং প্রস্থে পাদদেশে ৬৫০ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কমিতে কমিতে শীর্ষদেশে গিয়া মোটে ৪৫ ফুট থাকিবে। বাঁধটী মোট ১১৮০ ফুট দীর্ঘ হইবে। এই ১১৮০ ফুট গিরিখাত বন্ধ করিতে পারিলে নদীর জল পাহাড়ের কোলে জমিয়া ১১৫

মাইল দীর্ঘ ও ৮ মাইল প্রস্থ এক বৃহৎ হ্রদে পরিণত হইবে। হ্রদের পরিসীমা হইবে ৫৫০ মাইল এবং উহাতে প্রায় ৯ কোটী বিঘা-ফুট জল ধরিবে *।

নায়গ্রা জলপ্রপাতে যতখানি বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়, ঠিক ততখানি বিদ্যুৎশক্তি এই স্থানে পাওয়া যাইবে। বিদ্যুতের কারখানা (Power Station) করিতে প্রায় দশ কোটী টাকা ব্যয় হইবে।

ক্যালিফোর্নিয়া, আরিজোনা ও নেভাদা নগরগুলিতে উক্ত বিদ্যুৎশক্তি বিক্রয় করিয়া বহু টাকা আয় হইবে। হুভার বাঁধ হইতে পাহাড়ের মাথায় মাথায় ও মরুভূমির মধ্য দিয়া ২৬৫ মাইল দীর্ঘ পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া লস্ এঞ্জেল্স্ (Los Angeles) নগরে পানীয় জল লইয়া গিয়া বিক্রয় করা চলিবে। ইহাতেও বেশ মোটা আয় হইবে।

তাহার উপর বর্ত্তমানে সাধারণ নদীর মত গভীর ও চওড়া কয়েকটি খাল কাটিয়া ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের ইম্পিরিয়াল ও কোচিলা উপত্যকা দুটিতে জল লইয়া গিয়া লক্ষ লক্ষ বিঘা মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করিয়া তোলা হইবে। ভবিষ্যতে ইহাতেও আয় কম হইবে না। ভবিষ্যতে আরিজোনা ও নেভাদা প্রদেশের তৃষিত অংশগুলির তৃষ্ণা মিটাইবার সম্ভাবনাও রহিল। তখন আয় আরও বাড়িবে।

নদী যেরূপ দুর্দ্দান্ত, তাহাকে বাঁধিবার চেষ্টাও সেইরূপ বিশাল। কারিগরের অদ্ভুত পরিকল্পনার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে এই অদ্ভুত বাঁধ হইতে যে আয় হইবে, উহার দ্বারা এই বিশাল পরিকল্পনার বিপুল ব্যয়ের জন্য ঋণ ৫০ বৎসরে তাঁহারা পরিশোধ করিতে পারিবেন।

* এক বিঘা স্থানে এক ফুট গভীর জলের পরিমাণকে এক বিঘা-ফুট বলে।

খালপথ

(১) সুয়েজ

অনুর্ব্বর ভু-খণ্ডে জল সেচের জন্য খাল কাটিয়া নদীর জল লইয়া যাইবার ব্যবস্থার কথা মানুষের মনে বহু পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল। তাহার পর মানুষের মনে উঠা অস্বাভাবিক নহে যে, খালগুলি যদি গভীর ও বিস্তৃত করিতে পারা যায় তাহা হইলে নৌকা চলাচল করিতে পারিবে এবং লোক ও মাল বহনের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। তীব্র প্রয়োজনের অনুরোধেই যে মানুষের মাথায় বুদ্ধি খেলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এ বিষয়ে চীনেরা অগ্রণী বলিলেই হয়। উহাদিগের দেশের বৃহত্তম খালটি (Grand Canal) প্রায় এক হাজার মাইল দীর্ঘ। ইহা খৃষ্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে কাটা হয় এবং এখনও নষ্ট হয় নাই। খৃষ্ট জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিশরবাসিগণ একটি খাল কাটিয়া নীল নদের সহিত লোহিত সাগরের যোগ সাধন করেন, ফলে ইয়োরোপবাসিগণ তখন জল পথেই ভারত মহাসাগরে আসিতে পারিত। কালে রাজশক্তির সতর্ক দৃষ্টির অভাবে মরুভূমির বালির স্তূপ উড়িয়া আসিয়া উহাকে সম্পূর্ণ ভরাট করিয়া ফেলে। সিনাই উপদ্বীপের বক্ষে উহার চিহ্ন আজিও কোথাও কোথাও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সমস্ত আফ্রিকা পরিক্রম করিয়া ভাস্কো-ডি-গামা সেকালের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিলে ইয়োরোপবাসীদিগের দৃষ্টি এ বিষয়ে পুনরায় আকৃষ্ট হইল। ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মাঝে মোটে ১০০ মাইল দীর্ঘ ভূখণ্ড। ইহাকে কোন রকমে কাটিয়া খালপথ করিতে পারিলে, পথ কত যে সুগম ও সুলভ হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এ পরিকল্পনার মস্ত অন্তরায় নিষ্করুণ মরুভূমি। যে স্থানে নিয়ত ঝড়ের মুখে লক্ষ লক্ষ টন বালি উড়িতেছে, সেখানে খাল কাটিয়া উহাকে কয়দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারা সম্ভব? তাহার উপর মরুভূমির আলগা বালির মধ্যে খাল কাটা কি সম্ভব? কাটিতে না কাটিতে পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কাটা অংশ বুজাইয়া যে দিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ঐরূপ স্থানে অসংখ্য মজুর ও কারিগরের পানীয় জল, আহার বাসস্থান ইত্যাদি বহু প্রয়োজনের উপকরণাদি কি করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে? এই পরিকল্পনা কোন পাগলের মাথায় উদয় হইলেও এমন ত পাগল দেখা যায় না যে লাভের আশায় উহার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করিতে প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু এইরূপ এক ফরাসী পাগল খাল কাটিতে সঙ্কল্প করিলেন। পাগলের নাম (Ferdinand de Lesseps) ফার্দ্দিনান্দ্ দে লেসেপ্স্। ইংরাজ বৈশ্যজাতি, বৈশ্য-জাতি বড় হিসাবী ও কৃপণ হয়। বুদ্ধিমান ইংরাজ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া উহাকে অসম্ভব চেষ্টা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। প্রথম প্রথম কেহই তাঁহাকে ঐ চেষ্টায় অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে রাজি হইলেন না। এই খাল কাটা হইলে ইংরাজের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা, উহাকে আর আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারত, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ভূ-খণ্ডে যাইতে হইবে না। কিন্তু টাকার মায়া বড় মায়া; অনিশ্চিত লাভ ও সুবিধার আশায় ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ কোন রকমে কিছু দিতে সম্মত হইলেন না। ইংরাজের আর এক ভয় হইল ভারতের পথ দূর ও দুর্গম বলিয়া তাহারা নির্ব্বিঘ্নে উহা ভোগ করিতে পারিতেছে; খালপথে উহা নিকট ও সুগম হইলে ইয়োরোপের অন্যান্য দুর্দ্দান্ত জাতি আসিয়া উহাতে ভাগ বসাইতে পারে। এ ধারণা যে ভুল তাহা পরে প্রমাণিত হইল।

কিন্তু ফার্দ্দিনান্দ দমিবার পাত্র ছিলেন না। দুই বৎসরের অবিরাম চেষ্টায় ফরাসী জাতির ও মিশরবাসীর নিকট হইতে কাজ আরম্ভ

করিবার মত তিনি অর্থ সাহায্য পাইলেন। তাঁহার খালের পরিকল্পনা তৎকালের বড় বড় কারিগর পরীক্ষা করিয়া উহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। কাজ আরম্ভ করা হইল।

খাল কাটার সকল বাধাই তিনি অতিক্রম করেন, কিন্তু যখন অবিরাম আল্‌গা বালির পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত করিত, তখন তাহার মত দৃঢ়সঙ্কল্প ও অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তিও মাঝে মাঝে নিরাশ হইয়া পড়িতেন। ১৮৬৯ খৃঃ এই খালের খনন কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ভগবৎ কৃপায় তিনি ১৭ই নভেম্বর ১৮৭৫ খৃঃ এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। প্রথম দিনে ৬৮টী জাহাজ, সর্ব্বাগ্রে ফরাসী সম্রাজ্ঞীর জাহাজ খানি রাখিয়া, এইপথে যখন ভূমধ্যসাগর হইতে লোহিতসাগরে আসিয়া পড়িল, তখন অদ্ভুতকর্ম্মা ফার্দ্দিনান্দের প্রশংসায় জগত মুখর হইয়া উঠিল। ব্যয় হইল প্রায় বিশকোটী মুদ্রা কিন্তু সুখ সুবিধা ও লাভের তুলনায় এই ব্যয় অকিঞ্চিতকর। ভয়ঙ্কর মরু-প্রান্তরের ভয় কাটিল; পথ সুগম ও সুলভ হইল। এক পাগল, মরুভূমির মত আর এক দুর্দ্দান্ত পাগলকে, বশে আনিয়া শান্ত করিল।

এই খালটি দৈর্ঘ্যে ১০১ মাইল, গভীরতা কোথাও ৩৩ ফুটের অল্প নহে এবং প্রস্থে ১৯৮ ফুট হইতে ৩৫০ ফুট পর্য্যন্ত। ২৭০০০ টনের জাহাজ পর্য্যন্ত এই পথে চলাচল করিতে পারে এবং রাত্রে সন্ধানী আলো (Searchlignt) জ্বালিয়া ১৫ ঘণ্টায় খালটি পার হয়।

ইংরাজ বড় ধূর্ত্ত। সে দেখিল যে তাহার হিসাবে ভুল হইয়াছে এবং খালের পরিকল্পনা মোটেই পাগলামি নয়; উহা হইতে প্রচুর আর্থিক লাভ ত হইবেই, অধিকন্তু ঐ খালপথ ভবিষ্যতে তাহার সাম্রাজ্যের চাবিকাটিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। তখন হইতেই সে খালের আর্থিক অংশীদার হইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়; খুব শীঘ্রই সুযোগ জুটিল।

১৮৭৫ খৃঃ মিশরাধিপতি খেদিভের অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি, সুয়েজ খালের তাঁহার নিজ অংশগুলি, বিক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সুযোগে ইংরাজ খেদিভের সকল অংশগুলি উচ্চমূল্যে কিনিয়া লইয়া খালের উপর আংশিক কর্ত্তৃত্ব লাভ করিল। এখনও খাল কোম্পানীর অধিকাংশ কর্ত্তৃপদ অবশ্য ফরাসীদিগের হাতে, উহার প্রধান কার্য্যালয়ও (Head office) প্যারিস নগরে; কিন্তু খালের দুই পাশের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি ইংরাজের হাতে থাকায় উহা এখন ইংরাজদের করায়ত্ত বলিলেই চলে।

এই খালের লোহিত সাগরের মুখে সুয়েজ বন্দর (Port Suez) এবং ভূমধ্যসাগরের মুখে সৈয়দ বন্দর (Port Said)। সুয়েজ বন্দরের সহিত মিশরের রাজধানী কায়রো ও সৈয়দ বন্দরের রেলপথে সংযোগ আছে।

(২) পানামা

সুয়েজ খালের কৃতকার্য্যতায় ফার্দ্দিনান্দের আমেরিকায় ডাক পড়িল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝে মাত্র ৪০ মাইল ভূখণ্ড। ইহাকে কাটিয়া আট্‌লান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে যোগ সাধন করিয়া দিতে পারিলে, বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের খুব সুবিধা হয়।

তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। এই বয়সে তিনি ছুটিলেন আমেরিকায়। তিনি গিয়া দেখিলেন প্রস্তাবিত খালপথের মাঝে দাঁড়াইয়া আছে কুলেব্রা পাহাড়। খাল কাটিতে হইলে এই পাহাড়কে দ্বিখণ্ডিত করিতে হইবে। আর এক বিষম অন্তরায় হইল চাগ্রেস্ পার্ব্বত্যনদী।

তিনি সকল দিক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার পরিকল্পিত খালপথ আটলান্টিক উপকূলস্থ কোলোন (Colon) বন্দর হইতে

আরম্ভ হইবে। তাহার পর উহা চাগ্রেস্ নদীর উপত্যকা দিয়া ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রেণীর মাথায় মাথায় গিয়া সমুদ্রে পড়িবে। এই পরিকল্পনায় তাঁহার একটি মস্ত ভুল হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে দুই মহাসাগরের মধ্যস্থ ভূ-খণ্ড সাগরদ্বয়ের সমতলে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তাহার উপর বর্ষাকালে পার্ব্বত্যনদীর রূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে এবং পথের মাঝখান হইতে পাহাড় কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়াও সহজসাধ্য ছিল না।

তাঁহার হিসাব মত এই কাজ সম্পন্ন করিতে প্রায় ত্রিশ কোটী মুদ্রা ব্যয় হইবে এবং আট বৎসর সময় লাগিবে। পরিকল্পনা বিজ্ঞাপিত হইবা মাত্র টাকা উঠিয়া গেল। তাঁহার পটুতায় জনসাধারণের এতদুর বিশ্বাস ছিল যে সহস্র সহস্র দুঃখী পরিবার তাহাদিগের আজন্ম সঞ্চিত অর্থ উহাতে নিয়োজিত করিতে দ্বিধা বোধ করিল না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পূর্ণোৎসাহে কাজ আরম্ভ হইল। কাগজে লেখা পরিকল্পনা যতখানি সহজসাধ্য মনে হইতেছিল, প্রকৃত কাজে নামিয়া দেখা গেল—কল্পনা ও বাস্তবে আকাশপাতাল তফাৎ। সুয়েজ ও পানামার চারিদিকে ভূ-খণ্ড একই ধরণের মনে করিয়া ধরিয়া যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহাতে প্রতিপদে গরমিল দেখা দিল।

মিশরের শুষ্ক মরুভূমিতে ম্যালেরিয়ার বালাই ছিল না। এস্থানে বদ্ধ জলাতে এক প্রকার মশা জন্মায়, তাহার দংশনে পীতজ্বর (Yellow fever) নামে এক প্রকার মারাত্মক ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। এই মশার কামড়ে রীতিমত মড়ক দেখা দিল। রোজগারের আশায় মজুরের দল আসে, কিন্তু আর ফিরিয়া যায় না; ফলে, ক্রমশঃ মজুর দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

যে নদীটাকে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সহজেই বাঁধিতে পারিবেন, উহাকে বাঁধা সহজ হইল না। যে পর্ব্বতকে কাটিয়া তিনি পথ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কাজে নামিয়া উহা দুঃসাধ্য বোধ হইল।

ত্রিশকোটী টাকা দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার প্রতি লোকের তখনও বিশ্বাস অগাধ। টাকা চাহিবামাত্র আরও প্রায় ৫০ কোটী টাকা তিনি পাইলেন, কিন্তু ভাগ্য তাঁহার বিরূপ। অর্থের অপব্যয় হইতে লাগিল; কোটী কোটী টাকা চুরি ও অপব্যয় হইল। কোম্পানীটি পৃথিবীর চোর ও জুয়াচোরের একটি আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন। সহস্র সহস্র পরিবার নিঃসম্বল হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিতে লাগিল।

দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন এবং বহু লাঞ্ছনা ভোগের পরে বৃদ্ধ বয়সে কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হইল।

আর একটি নূতন কোম্পানী নূতন উৎসাহে এই কাজে নামিয়া পূর্ব্বগামী কোম্পানীর মত হার মানিয়া কাজ বন্ধ করিল। এ কাজ বোধ হয় কোন দিনই সম্পন্ন হইত না, কিন্তু দুইটী অভাবনীয় কারণে এই কাজে পুনরায় হাত পড়িল।

১। ম্যালেরিয়ার কারণ ও উপায়

স্যার রোনাল্ড রস্ (Sir Ronald Ross) আবিষ্কার করেন যে মানুষের ম্যালেরিয়া রোগ এক জাতীয় মশকের দংশনে হয়। সেই জাতীয় মশক জলায় গাছপালার আশ্রয়ে ডিম পাড়ে। এই ডিম নষ্ট করিতে পারিলে নূতন মশা আর জন্মিবে না এবং পুরাতন মশাগুলি আয়ু ভোগ করিয়া মরিয়া গেলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস পাইবে। কুইনিন্ ম্যালেরিয়ার যম বলিলেও চলে। দরজা জানালার তারের জালি ব্যবহার করিলে জলার মশা ঘরে ঢুকিয়া কামড়াইতে পারিবে না এবং রাত্রে শুইবার সময় মশারি ব্যবহার করিলে মশক দংশন করিবার কোন সুযোগ পাইবে না।

২। পানামা বিদ্রোহ

একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ঐ কাজে হাত দেওয়া সম্ভবপর ছিল। যুক্তরাষ্ট্র খালপথের উভয় পার্শ্বে পাঁচ মাইল ব্যাপী ভূমিখণ্ড কিনিতে পাইলে তবেই কাজে নামিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। খালের উভয় পাশ্বের জমির উপর সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার না থাকিলে রোগ দমন করিতে পারা যাইবে না এবং মজুরদিগকে স্বাস্থ্যবিধি পালন করিতে বাধ্য করিতে পারা যাইবে না, এই কারণে তাঁহারা ঐ ভূ-খণ্ড কয়েকটি সর্ত্তে কিনিতে চাহিলেন। তখন পানামা কোলোম্বিয়ার অধীন একটি জেলা মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রবল প্রতিবেশীকে পানামার মধ্য দিয়া আংশিক স্বাধীন ভূখণ্ড ভোগ করিতে দিলে উহার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে ভাবিয়া কোলোম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সর্ত্তে রাজী হইল না। কর্ত্তাবার্ত্তা ভাঙ্গিয়া গেল। ঠিক এই মুহুর্ত্তে পানামা বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। যুক্তরাষ্ট্র সুযোগ বুঝিয়া পানামাকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করিয়া লইয়া খালপথের ভূখণ্ড নিজ সর্ত্তে বন্দোবস্ত করিয়া লইল। পুনরায় ১৯০৩ খৃঃ কাজ আরম্ভ হইল।

যুক্তরাষ্ট্র কাজে নামিয়া প্রথমেই স্থানটি হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য মশক বংশ উচ্ছেদে মনোনিবেশ করিল। জলায় কেরোসিন ছড়াইয়া দিলে উহা জলের উপর ভাসিতে থাকে। মশককীট জলের উপর একটি নলের সাহায্যে নিশ্বাস গ্রহণ করে। জলে তৈল পড়ায় বেচারারা বায়ুর অভাবে নিশ্বাস লইতে না পারায় মারা পড়ে। এইরূপে মশক বংশ অঙ্কুরেই বিনাশের ব্যবস্থা হইল।

স্বাস্থ্যরক্ষার নানা ব্যবস্থায় মশকবংশ উচ্ছেদ করিয়া, পীতজ্বর হইতে মজুরদিগের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহারা প্রকৃত কাজে মন দিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুই মহাসাগরের ব্যবধান সাগর পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮৫ ফুট উচ্চ। এক সাগর হইতে আর এক সাগরে যাইতে হইলে হয় ৮৫ ফুট

উঠিতে হইবে, কিংবা ৮৫ ফুট নামিতে হইবে। এই খালপথের কতকাংশে লৌহ-দ্বারের (Lockgate) সাহায্যে হাজার ফুট দীর্ঘ তিনটি চৌবাচ্ছা করা হইল *।

এইরূপ চৌবাচ্ছা করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা ৪৫ ফুট গভীর এবং আধ মাইল দীর্ঘ একটি খাত খুঁড়িয়া চারিদিকে পর্ব্বত বেষ্টিত এক উপত্যকা-ভূমিকে জলময় করিয়া সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা মত এক বৃহৎ হ্রদের

দ্বিখণ্ডিত কুলেব্রা দিয়া পানামা খাল পথ

সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর উল্লিখিত লৌহ-দ্বারের সাহায্যে ধাপে ধাপে জাহাজ তুলিবার ও নামাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এইজন্য পানামা খাল না বলিয়া পানামা সেতু বলিলেই ভাল হয়।

তাহার পর কুলেব্রা পাহাড়ের কতকাংশ কাটিয়া ফেলিয়া কারিগরেরা খালের পথ করিলেন। ৪৮ কোটি টন পাথরের টুকরা ও মাটি কাটিয়া খালের পথ করিবার জন্য হাতের কোদালি ও গাঁইতি

* "পরের প্রবন্ধ" দেখ, পৃঃ ৯৮

চালাইয়া, এইরূপ বিশাল কাজ করা অসম্ভব। এইরূপ স্থলেই কলের কোদালিব প্রয়োজন। পানামা খাল কাটিতে ৯৮টী কলের কোদালি ব্যবহার করা হয়। ইহারা এক এক কোপে ৫।১০ টন্ মাটি ও পাথরের টুকরা চাঁচিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া দিত। অবশ্য পূর্ব্বেই ডিনামাইট বা অন্য কোন বিস্ফোরক পদার্থ দিয়া পাহাড় ফাটাইয়া লওয়া হইত।

যুক্তরাষ্ট্রের এই খালটি করিতে ১০ বৎসর লাগে এবং ব্যয় পড়ে এক শত কোটী মুদ্রারও অধিক।

ক্যারিয়াবিন (Cariabean) সমুদ্র হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এই খালপথটি প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ। ইহার প্রস্থ তিন শত ফুট হইতে সহস্র ফুট পর্য্যন্ত এবং ইহা গড়ে ৪৫ ফুট গভীর। এই খালপথে এক সাগর হইতে আর এক সাগরে যাইতে জাহাজের সাত আট ঘণ্টা সময় লাগে।

১৯১৪ খৃঃ ১৫ জুন ইহার কার্য্য শেষ হইল, কিন্তু মাঝে মাঝে পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকায় ১৯১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত খালটি ঠিক রীতিমত চালু হয় নাই। ইহার পর আর কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই এবং খালপথটি আজ পর্য্যন্ত পরিষ্কার রাখিতে পারা গিয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জুন খালটি জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

পানামা খালের নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে উহার সম্পর্কে একটী মোটামুটি ধারণা জন্মিবে :

১। লম্বা ৫০ মাইল ; গড়ে ৪৫ ফুট গভীর এবং ৩০০ ফুট হইতে ১০০০ ফুট পর্য্যন্ত চওড়া।

২। গটুম বাঁধ (Gutum), বাঁধের শীর্ষদেশে দৈর্ঘ্যে ৮০০০ ফুট ও প্রস্থে ২১০০ ফুট ; হ্রদের জল হইতে বাঁধের মাথা ৩০ ফুট উচ্চ।

৩। কুলেব্রা পাহাড়, ৯ মাইল কাটিতে হইয়াছে।

৪। জাহাজ তুলিবার ও নামাইবার চৌবাচ্ছা :—

(ক) গটুম লক (Gatum Locks)। তিনটি, গটুম হ্রদে তুলিবার জন্য ও পাশা পাশি তিনটী, নামাইবার জন্য; চৌবাচ্ছাগুলি হাজার ফুট লম্বা।

(খ) পেড্রো মিগুয়েল (Pedro Miguel Lock)। ঐরূপ একপ্রস্থ (Set) উঠিবার ও নামিবার জন্য।

(গ) মিরা ফ্লোর্স লক (Mira Flores Lock) এইরূপ দুই প্রস্থ উঠিবার ও নামিবার জন্য। ১১০০ ফুট চওড়া।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে খালের গণ্ডিস্থ ভূ-খণ্ডের পরিমাণ ৪৩৬ বর্গ মাইল। এবং খালের উভয় পার্শ্বের ভূমি ১০ মাইল বিস্তৃত।

(৬) জাহাজের পার হইতে সময় লাগে সাত আট ঘণ্টা, ইহার মধ্যে চৌবাচ্ছাগুলি পার হইতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

(৭) ব্যয় ৩৭৫, ০০০, ০০০, ডলার (১ ডলার—প্রায় ৩ টাকা)।

৮) ৪০, ০০০ মজুর নিযুক্ত হইয়াছিল।

পানামা খালপথের সুবিধা

পথ	হর্ণ অন্তরীপ হইয়া	পানামা খাল দিয়া	কত পথ বাঁচিল
নিউইয়র্ক হইতে—	মাইল	মাইল	মাইল
স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো	১৪,৮৪০	৫,৩০০	৯,৫৪০
হোনোলুলু	১৪,২৩০	৬,৭৪৫	৭,৪৮৫
ম্যানিলা	১৭,৪৫২	১১,৫৮০	৫,৮৭২
য়োকোহামা	১৭,৬৭১	৯,৭৪৪	৭,৯৩৫
হংকং	১৮,১৮৯	১১,৩৪৬	৬,৮৪৩
মেলবোর্ন	১৩,৫০২	৯,৯৭১	৩,৫৩১
ভ্যাল্‌প্যারাইসো	৯,৭৫০	৪,৬৩৭	৫,১১৩
স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো হইতে—			
লিভারপুল	১৫,১৩২	৭,৮৫৭	৭,৩৯৩
হামবুর্গ	১৫,৬০৩	৭,৯৫২	৭,৬৫১
জেনোয়া	১৫,১৩২	৮,৫১১	৬,৬২১

নিউইয়র্ক হইতে পানামা ২,০২৩ মাইল। স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো হইতে পানামা ৩,৩৭৭ মাইল।

উচ্চ প্রদেশে জাহাজ তোলা

আমাদের ভারতবর্ষে কাশ্মীরের মত ঢালু প্রদেশে নদীতে জল তেমন দাঁড়াইতে পায় না। সেরূপ স্থলে নদীতে নৌকা যাতায়াত করা একেবারে অসম্ভব। নিম্নলিখিত কৌশল উদ্ভাবিত না হইলে পৃথিবীতে অতি প্রয়োজনীয় এরূপ বহুস্থলেই জাহাজ যাতায়াত সম্ভবপর হইত না। আজ যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থলস্থ অতি সঙ্কীর্ণ পাহাড় কাটিয়া আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয়ে যাতায়াত সুগম ও দ্রুতগতি করা সম্ভব হইয়াছে, তাহাও এই কৌশলের গুণে।

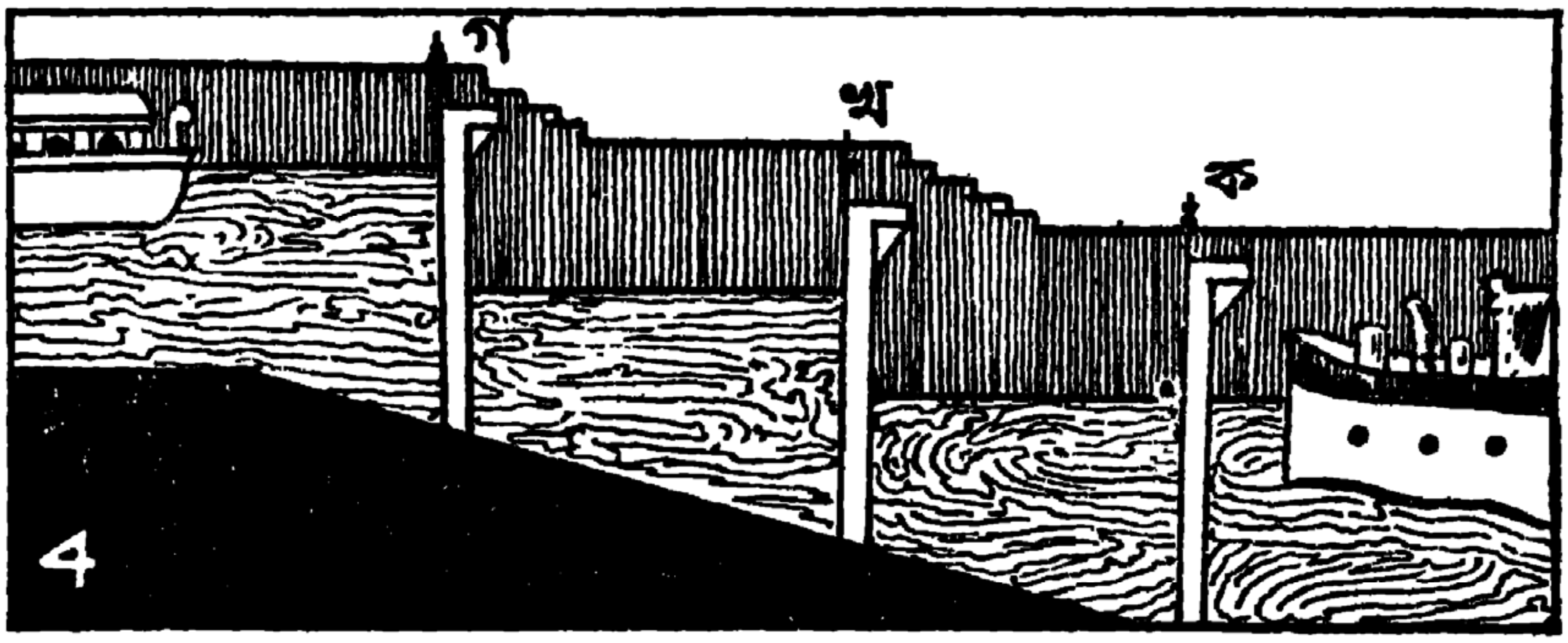

১ম চিত্র

এইরূপ ঢালু প্রদেশের নদীপথে ক, খ, গ, ইত্যাদির মত কতকগুলি সমদূরবর্ত্তী ইস্পাতের কপাটের ব্যবস্থা করিয়া জল ধরিয়া রাখার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। দুইটী কপাটের মধ্যে ধরা জলের মাথার হ্রাসবৃদ্ধির জন্য কপাটের গায়ে কতকগুলি নর্দ্দমার ব্যবস্থা থাকে।

কোন নৌকা বা জাহাজ এইরূপ নদী বা খালপথের নিম্ন মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ক কপাটের সম্মুখে কপাটটী খুলিয়া দেওয়া হয় এবং জাহাজটী প্রথম কুঠরীতে প্রবেশ করে। এই কুঠরীর প্রথম

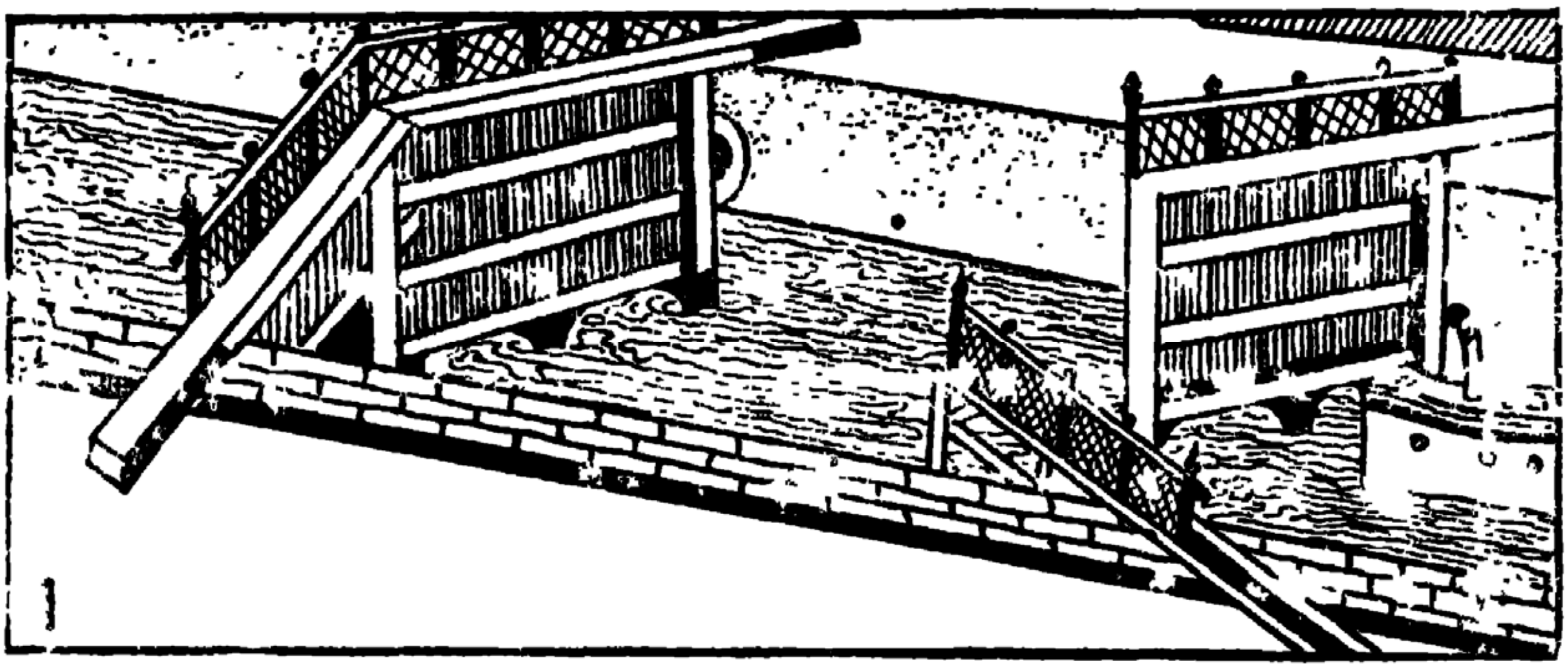

কপাটের বাহিরের ও ভিতরের জলের মাথা এক হওয়ায় জাহাজ প্রবেশ করিবার কোনই অসুবিধা হয় না। তাহার পর জাহাজ মুক্তদ্বার পার হইয়া গেলে পুনরায় লৌহদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

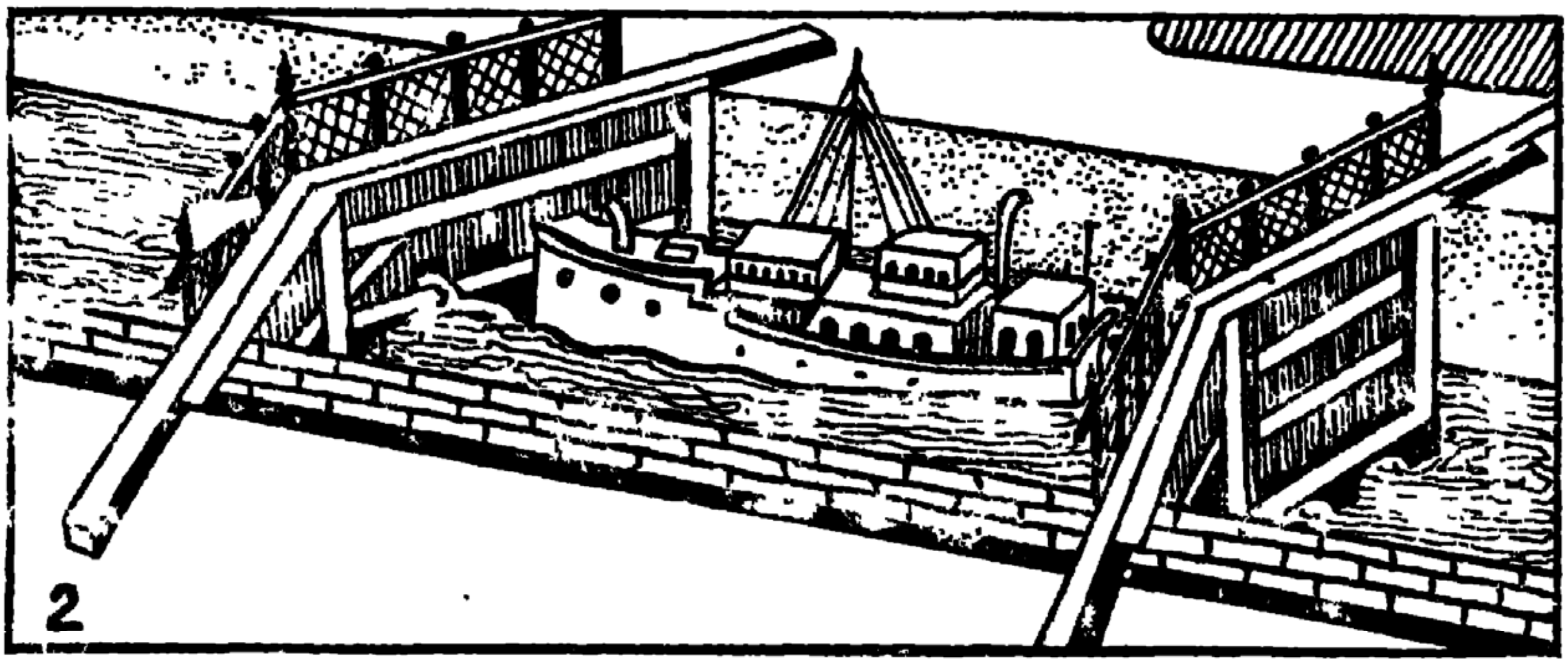

প্রথম কুঠরীর ও দ্বিতীয় কুঠরীর জলের মাথা কিন্তু এক নহে (১ম চিত্র)। দুইটী কুঠরীর জলের মাথা এক করিবার জন্য দ্বিতীয়

(খ) দ্বারের নর্দ্দমাগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উচ্চ কুঠরী হইতে জল নিম্ন কুঠরীতে নামিয়া আসিয়া দুইটী কুঠরীর জলের মাথা এক করিয়া দেয়। প্রথম কুঠরীর জলের মাথা উঠার সহিত জাহাজটীও উঠিতে থাকে। ইহার পর দ্বিতীয় দ্বার (খ) খুলিয়া দেওয়া হয়। দুইটী কুঠরীর জলের মাথা এক হওয়ায় দ্বারের উভয় পার্শ্বের জলের চাপ সমান হয়, সেইজন্য লৌহদ্বার সহজেই খুলিতে পারা যায়। এইবারে জাহাজটী দ্বিতীয় কুঠরীতে যাইয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে জাহাজখানিকে একে একে কয়েকটী কুঠরী পার করাইয়া ক্রমশঃ নিম্নভূমি হইতে উচ্চ ভূমিতে তোলা হয়।

এইরূপ উপায়ে আমরা যেরূপ সোপান বহিয়া দোতলা তেতলায় উঠি, ঠিক সেইরূপ কয়েকটী কুঠরী ও লৌহদ্বারের সাহায্যে পানামা খালের পার্ব্বত্য পথে বৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে ৮৫ ফিট তুলিয়া বা নামাইয়া এক সমুদ্র হইতে অন্য সমুদ্রে লইয়া যাওয়া হয়।

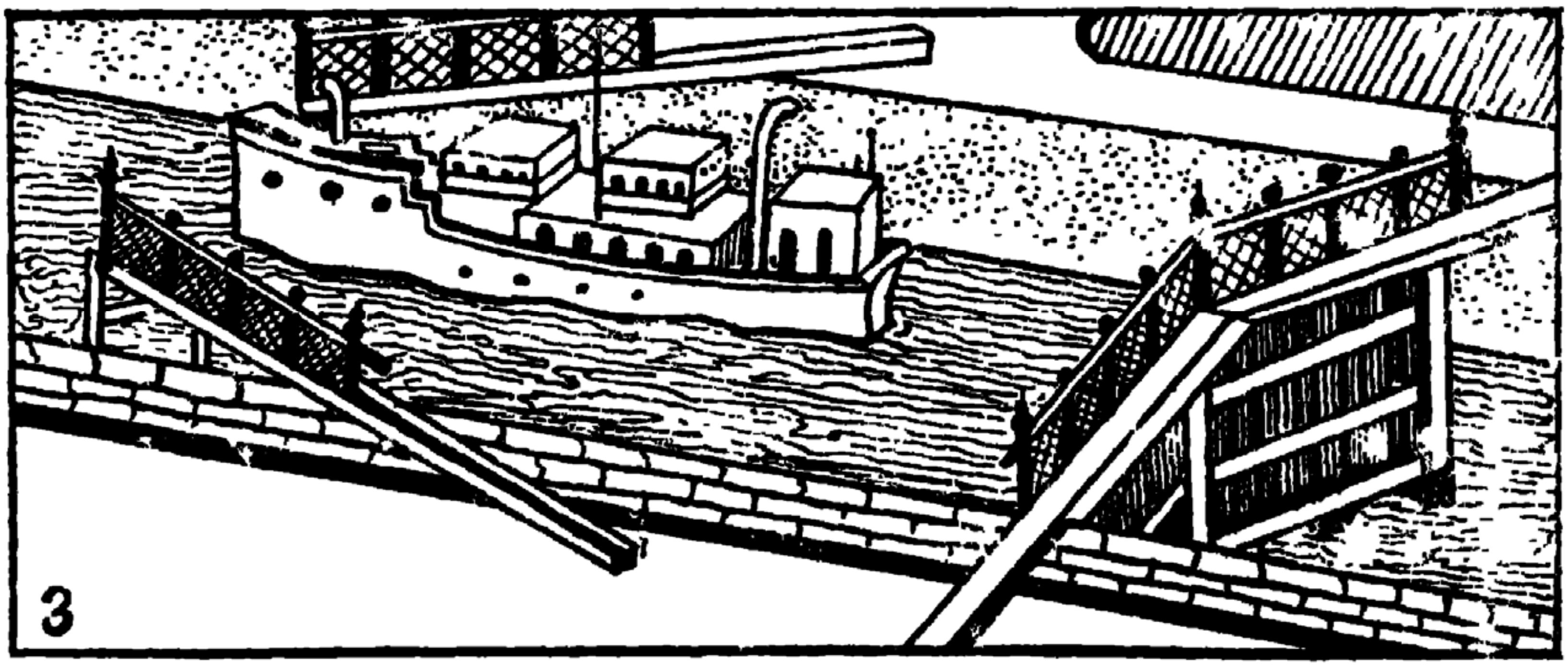

উচ্চ প্রদেশ হইতে নিম্ন প্রদেশে জাহাজ নামাইবার সময় বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। প্রথম চিত্রের গ কপাটের নিকট জাহাজ-

খানি আসিলে উহার নর্দ্দমাগুলি খুলিয়া গ খ কুঠরীর জলের মাথা বাহিরের জলের মাথার সমান করা হয়। ভিতর কুঠরীর জলের মাথা উঠিয়া বাহিরের জলপথের জলের মাথার সঙ্গে সমান হইবার পর গ কপাট খুলিয়া দিয়া জাহাজখানিকে গ খ কুঠরীতে লইয়া আসা হয়।

তাহার পর খ কপাটের নর্দ্দমাগুলি খুলিয়া দিয়া গ খ এবং খ ক কুঠরী দুইটীর জলের মাথা এক করা হয়। তাহার পর খ কপাট খুলিয়া দিয়া জাহাজখানিকে ক খ কুঠরীতে লইয়া আসা হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সর্ব্বনিম্ন কুঠরীতে জাহাজখানিকে আনিয়া উহার সন্মুখস্থ কপাট খুলিয়া দিলে জাহাজখানি নিম্ন সমতল প্রদেশস্থ নদীপথে সহজে চলিতে আরম্ভ করে। ছোট ছোট জল পথে কপাট বা কপাটের নর্দ্দমাগুলি হাতেই খোলা ও বন্ধ করা হয়; কিন্তু বড় বড় জলপথে বিজলীর সাহায্যে এই কার্য্য করা হয়।

জুইডার জী (Zuider Zee)

হল্যাণ্ড দেশের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। ইয়োরোপের পশ্চিম উপকূলে ডেনমার্ক ও বেলজিয়মের মধ্যে এই ছোট দেশটি। রাইন্, মিউজ ও শেল্ড নদী তিনটী যে 'ব' দ্বীপটি গড়িয়াছে, ঐগুলি মিলিয়াই হইল হল্যাণ্ড। এই ভূখণ্ডের কতকাংশ সমুদ্র পৃষ্ঠ অপেক্ষা নিম্নভূমি বলিয়া দেশবাসীদিগকে সর্ব্বদাই অতি সতর্ক থাকিতে হয়, পাছে সমুদ্র ঐ অংশ গ্রাস করে। সেইজন্য দৃঢ় বাঁধ দিয়া সমুদ্রের গ্রাস হইতে ভূ-খণ্ডকে সযত্নে রক্ষা করিতে হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু নানা সতর্ক ব্যবস্থা সত্ত্বেও দেশবাসীর ভাগ্য বড় বিরূপ। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র রাক্ষস ৩০টী জনাকীর্ণ গ্রাম গ্রাস করে। একবার ১৪২১ খৃষ্টাব্দে ৭২টী ঘন বসতি পুর্ণ সম্পদশালী গ্রাম ঐ রাক্ষসের জঠরে আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ ভয়ঙ্কর বন্যায় লক্ষাধিক লোক সমূদ্রে ডুবিয়া মরে এবং এক অতি উর্ব্বর ভূ-খণ্ড জলায় পরিণত হয়।

এই উৎপাতের উপর আর এক উৎপাত আসিয়া জুটিয়াছে। ঐ ভূ-খণ্ড ক্রমশঃ বসিতেছে। নিম্নভূমি ক্রমশঃ নিম্নতর হওয়ায় প্রচুর শস্যপ্রসূ জনপদমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র হ্রদ আকারে বাড়িতে বাড়িতে আজ ৮০ মাইল দীর্ঘ ও ৪৫ মাইল প্রস্থ এক স্বল্প গভীর বিশাল উপসাগরে পরিণত হইয়াছে। দেশ অতি ক্ষুদ্র, উহা হইতে এতখানি ভূ-খণ্ড সমুদ্র গ্রাস করিয়া লইলে দেশবাসীর কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু কর্ম্মঠ হল্যাণ্ডবাসীর পুরুষকারের উপর অত্যন্ত বিশ্বাস। উহারা এত প্রাকৃতিক পীড়নেও দমিবার পাত্র নহে। এতদিন উহারা প্রাকৃতিক পীড়ন বাধ্য হইয়া সহ্য করিত, কিন্তু এখন বিজ্ঞানের সাহায্যে উহারা হৃত ভূ-খণ্ড পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কাজে নামিয়াছে এবং বহুলাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

আমষ্টারডাম্ হইতে ১১ মাইল দূরে বৃহৎ হারলেম হ্রদটিকে প্রথমে উহারা ছেঁচিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিল। এই কাজ করিবার জন্য উহারা তিনটী ইঞ্জিন লাগাইল। এই ইঞ্জিনগুলি দিনে দশ লক্ষ টন্ জল ছেঁচিয়া ফেলিতে পারে। চারিবৎসরে এইরূপে হ্রদ্ হইতে জল তুলিয়া, খালপথে সমুদ্রে লইয়া গিয়া অগভীর বিশাল হ্রদটী শুষ্ক করিয়া চাষের উপযুক্ত করা হইল। এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়ায় উহারা জুইডার-জীর উপসাগরটিও ছেঁচিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমুদ্র হল্যাণ্ডের নিম্নভূমিখণ্ড ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া ফেলায় এই অগভীর বিশাল উপসাগরটীর সৃষ্টি হয়। ইহার ক্ষেত্রফল প্রায় ১২০০ বর্গ মাইল। উত্তর সাগরের (North Sea) সহিত সংযোগের মুখে পূর্ব্বের ভূ-খণ্ডের কয়েকটী উচ্চ অংশ এখনও ডোবে নাই বলিয়া কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দ্বীপগুলির মাঝে মাঝে সঙ্কীর্ণ নালাপথে সমুদ্রের জল জোয়ার ভাটার সময় এই উপসাগরে আনাগোনা করে।

এই সঙ্কীর্ণ নালাপথগুলিতে বাঁধ দিয়া সমুদ্রের সংযোগ ছিন্ন করিতে পারিলে উপসাগরটী এক বিশাল হ্রদে পরিণত হইবে। তখন জল ছেঁচিয়া ফেলিলে শুষ্ক ভূমিতে চাষ আবাদ চলিবে।

১৯[illegible] খৃষ্টাব্দে বাঁধ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। দ্বীপগুলির মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড বাঁধগুলি মিলিয়া একটী ১৯ মাইল দীর্ঘ বিশাল বাঁধ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হওয়ায় সমুদ্রের জল জোয়ারের সময় আর উপসাগরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার পর উহার জল ছেঁচিয়া কয়েকটী খালপথে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া মোটে ৮২০ বর্গমাইল ভূ-খণ্ড সমুদ্রের গ্রাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। জুইডার-জীর মধ্যাংশ অপেক্ষাকৃত গভীর হওয়ায় প্রায় ৪০০ বর্গমাইল একটি হ্রদ চারিপার্শ্বের ক্ষেত্রের জল জমিবার জলাশয়রূপে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থানে

কেবলমাত্র নোনা মাছের চাষ হইত, মানুষ পুরুষকার বলে সেইস্থানে এখন সোনার ফসল ফলাইতেছে।

ভাগ্য যাহা একদিন কাড়িয়া লইয়াছিল, মানুষ পুরুষকার বলে তাহা এতদিনে ফিরিয়া পাইয়াছে। অদৃষ্টের দোহাই দিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে হৃত-ভূখণ্ড হল্যাণ্ডবাসী কিছুতেই ফিরিয়া পাইত না।

আমাদের দেশেও অনুরূপ ভাবে এক খণ্ড-ভূমি সম্প্রতি উদ্ধার করা হইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণে বারুইপুরের নিকটে উত্তরভাগ আরপাঁচ বলিয়া পরিচিত প্রায় ৫০ বর্গ মাইল এক ভূ-খণ্ড অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহাতে সোণার ফসল ফলিত। পার্শ্বস্থ পিয়ালী নদী কলিকাতার ময়লার মজিয়া যাওয়ায় এই ভূ-খণ্ডের জল নিকাশে বাধা পড়িল। ফলে এই ভূ-খণ্ড ক্রমশঃ এক স্বল্প-গভীর জলায় পরিণত হইল। সমৃদ্ধ জনপদের স্থান গ্রহণ করিল, এক অস্বাস্থ্যকর বিসাক্ত কীট মশক সর্পামাকীর্ণ ভয়ঙ্কর জলাভূমি। চারিটি অতি শক্তিশালী পাম্প বসাইয়া এই স্থানের জল ছেঁচিয়া ফেলা হইতেছে। ইতিমধ্যেই সে স্থানের কতক জমিতে ধানের চাষ করিয়া প্রচুর ফসল পাওয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও ভাগ্য যাহা একদিন কাড়িয়া লইয়াছিল ; মানুষ পুরুষকার বলে ধীরে ধীরে তাহা উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

"ব" দ্বীপের ভূমি বড়ই উর্ব্বরা হয়। নোনা জলের আনাগোনা বন্ধ করিতে পারিলেই ঐ ভূ-খণ্ডে সোনার ফসল ফলাইতে পারা যায়। এই ভূ-খণ্ডের চারিদিকে বাঁধ দিয়া জোয়ারের মুখে পলিমাটিপূর্ণ নদীর জল খালপথে এই বাঁধ বেষ্টিত ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, আবার ভাঁটার মুখে ঐ জল বাহির করিয়া দিলে পরিত্যক্ত পলিমাটি বসিয়া উক্ত ভূ-খণ্ডকে ক্রমাগত ভরাট করিতে থাকে। কিছুদিন পরে এই প্রকারে ঐরূপ নিম্নদেশগুলি উচ্চ ভূ-খণ্ডে পরিণত করিতে পারা যায়। তখন সমদ্রের নোনা জল জোয়ারের মুখে উক্ত জমিতে প্রবেশ করিয়া ফসল নষ্ট করিতে পারে না।

পিরামিড

মানুষের কালজয়ী কীর্ত্তিগুলির মধ্যে পিরামিডের আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পিরামিডগুলির মধ্যে মিশরপতি খুফুস্ (Khufus) নির্ম্মিত পিরামিডটি আকারে ও পরিকল্পনায় বিশালতম।

প্রাচীন মিশরবাসীগণের বিশ্বাস

মিশরপতি খুফুস্ খৃষ্ট জন্মের ৪৭০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া মিশর শাসন করেন। সেকালে মিশরবাসীগণ বিশ্বাস করিতেন যে মানুষের মৃত্যুর পরেও উহার আত্মা বাঁচিয়া থাকে এবং বাঁচিয়া থাকা কালীন অভ্যস্ত জীবন অনুসারে পারলৌকিক জীবন ভোগ করে।

এই বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁহারা মৃতদেহ হইতে পচনশীল নাড়ীভুঁড়িগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া দেহটিতে নানা ঔষধি লেপন করিতেন এবং উহাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া কাঠের শবাধারে রাখিয়া উহার মুখ আঁটিয়া দিতেন। তাহার পর ঐ কাঠের শবাধারটি আর একটি পাথরের শবাধারে রাখিতেন।

মিশরপতিগণ নিজেদের জীবদ্দশায় নিজ নিজ প্রস্তর নির্ম্মিত শবাধারটি রাখিবার জন্য এক একটি বিশাল পিরামিড নির্ম্মাণ করিতেন। দেহান্তে তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীগণ ঐরূপ নির্ম্মিত পিরামিডের গোপন কক্ষস্থিত পাথরের শবাধারে তাঁহাদের মৃতদেহগুলি রাখিয়া দিতেন এবং তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় ব্যবহৃত খাট তৈজস পত্রাদি, পোষাক, রত্নালঙ্কার ও অস্ত্রাদি মহার্ঘ বস্তুগুলি সেই ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন। তাহার পর উক্ত কক্ষে প্রবেশ করিবার গুপ্তদ্বার বন্ধ করিয়া দিতেন। ঐ ঘরে যাইবার গুপ্তপথ মৃতের দুটি পাঁচটি অন্তরঙ্গ ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিত না। তাঁহার ব্যবহৃত মূল্যবান দ্রব্যাদি লুন্ঠিত হইবার ভয়ে এইরূপ সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত।

মিশরবাসীগণ মিশরপতিকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেন। সেইজন্য শক্তিশালী সম্রাটের পিরামিডের পূর্ব্বদিকে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত মৃত নরপতির মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনান্তে উহার পূজার ব্যবস্থা করা হইত।

বর্ত্তমান মিশরের কায়রো নগর হইতে দশ মাইল দূরে গিঝে (Gizeh) বলিয়া একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের অপর দিকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় এক মাইল একটী অতি ক্ষুদ্র মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মরুভূমিতেই প্রাচীন মিশরের সকল পিরামিডগুলি অবস্থিত। এইরূপ ক্ষুদ্রস্থানে এতগুলি কালজয়ী প্রাচীন কীর্ত্তির সমাবেশ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

খুফুসের পিরামিডের বিবরণ

খুফুসের পিরামিডটির সর্ব্বনিম্নতলের ক্ষেত্রফল প্রায় ৪০ বিঘা। চতুষ্কোণ তলটির প্রতি বাহুটি ৭৬৪ ফুট দীর্ঘ। ইহার উচ্চতা পূর্ব্বে ছিল ৪৮০ ফুট, এখন মানুষের পাথরের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে ৪৫০ ফুট মাত্র। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এই পিরামিডটি নির্ম্মাণ করিতে ৭০ মণ ওজনের ২৩ লক্ষ পাথরের টুকরা লাগিয়াছিল। সেকালে বর্ত্তমানের মত মাপিবার সূক্ষ্ম যন্ত্র ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পিরামিডটির সর্ব্বনিম্ন চতুষ্কোণ তলের দীর্ঘাকার বাহুগুলি একালের সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়া অতি সাবধানে মাপিয়াও দুই আঙ্গুলের অধিক ত্রুটি পাওয়া যায় নাই।

এই বিশাল রাজকীয় স্মৃতিপ্রাসাদগুলি নীলনদের এক তীরে অবস্থিত এবং দেখা যায় অপর তীরভূমির খনিগুলি হইতে প্রয়োজনীয় পাথর কাটিয়া আনা হইয়াছিল।

যাঁহারা পিরামিডগুলি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা এমন কোন নিদর্শন

রাখিয়া যান নাই, যাহা হইতে তাঁহাদের নির্ম্মাণ বিবরণ কিছু জানিতে পারা যায়। তবে গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) কর্ত্তৃক বহুপরে সংগৃহীত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে নীল নদে বন্যা আসিলে বৎসরের ঐ তিন মাসে বড় বড় ভেলায় করিয়া অপর পার হইতে কাটা পাথরের টুকরাগুলি আনা হইত এবং এই ৭০-মণী পাথরগুলিকে নদীবক্ষ হইতে পিরামিডের পাদদেশে গড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি ক্রমশঃ-উচ্চ ঢালু পথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

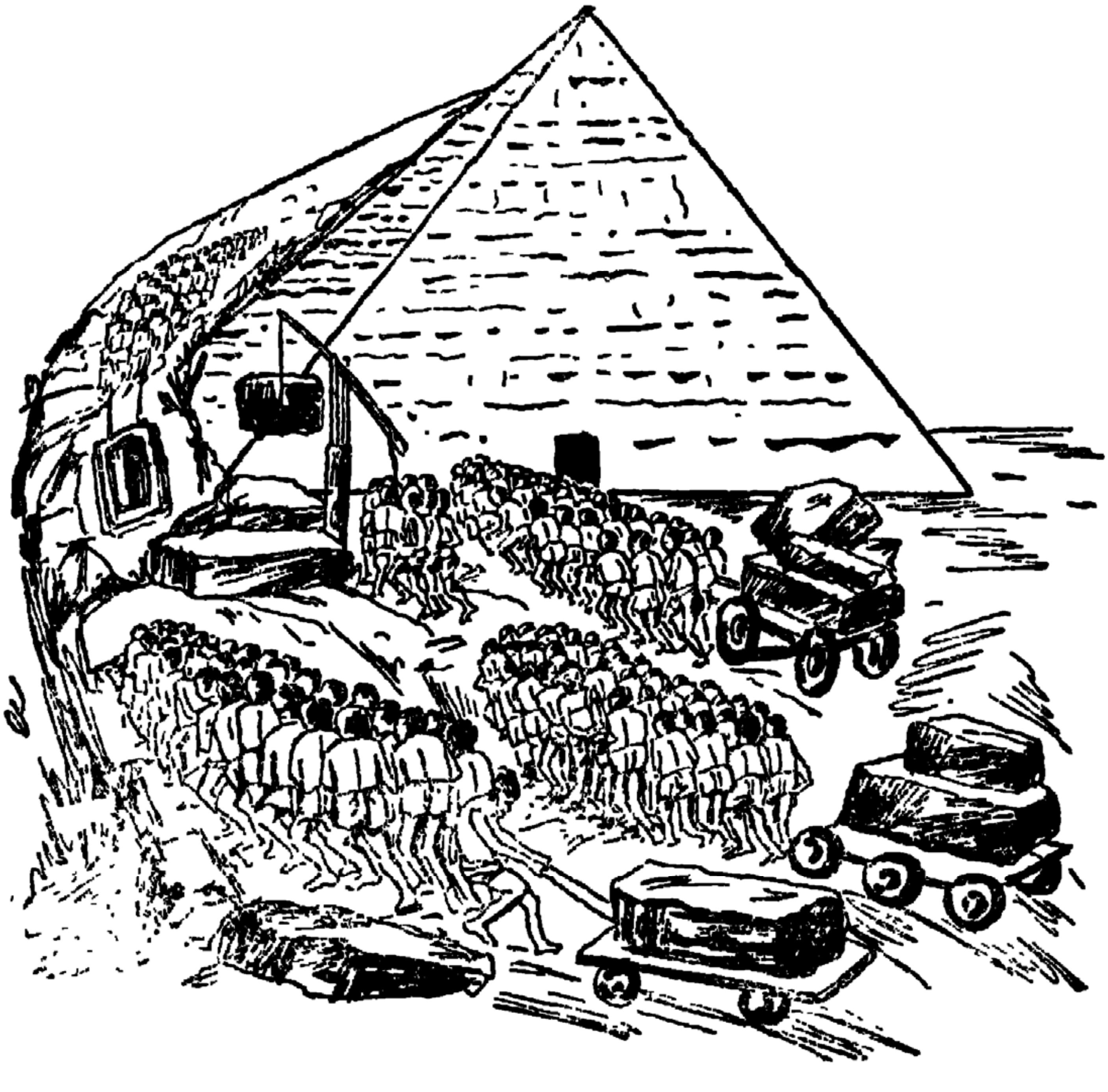

পিরামিড বেড়িয়া ঢালু পথে পাথর উঠান হইতেছে

গাঁথা পিরামিডের উচ্চতা অনুযায়ী এই ঢালু পথটি পিরামিডকে বেড়িয়া বেড়িয়া ক্রমশঃ উচ্চ করা হইত।

এই পথটি নির্ম্মাণ করিতে নাকি দশ বৎসর লাগিয়াছিল। বৎসরের

তিন মাস বন্যাঋতুতে এক লক্ষ লোক পাথরগুলি কেবল গড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। এই একলক্ষ মজুর ব্যতীত ৩৫০০ হইতে ৪০০০ রাজমিস্ত্রী এই পাথরগুলিকে গাঁথিবার জন্য বার মাস নিযুক্ত থাকিত। উহারা বিশ বৎসর ধরিয়া অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া খুফুসের আত্মার বাসস্থানের জন্য এই কালজয়ী বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে।

পিরামিডের একটি পাথরের সহিত আর একটি পাথরের জোড় দেখিলে এখনও আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই পাথরগুলি মসলা দিয়া এত পরিষ্কার করিয়া পরস্পরের সহিত জোড়া হইয়াছিল যে মনে হয়, সবগুলি মিলিয়া একখানি পাথর। পূর্ব্বে পিরামিডগুলির বহিরাংশ মসৃণ ছিল; পরে লোকেরা নিজেদের বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য কতক কতক পাথর খুলিয়া লওয়ায় এখন ধাপে ধাপে পিরামিডের চূড়ায় সহজেই উঠিতে পারা যায়।

এই বিশাল পিরামিডগুলির মধ্যস্থিত কতকগুলি কক্ষ ও পথ ব্যতীত ঐগুলি আগাগোড়া নিরেট (solid)। পিরামিডগুলি প্রায় ছয় হাজার বৎসরের পুরান। কিন্তু এতদিন ধরিয়া মরুভূমির তীব্র বালির ঝাপটায় উহার কিছুই ক্ষতি করিতে পারে নাই। উহারা আজিও নির্ম্মম মরুবক্ষে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া কারিগরের অমর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এ বিষয়ে একালের কারিগরকে সেকালের কারিগরের নিকট হার মানিতে হয়।

পিরামিডের রাজকক্ষ

পিরামিডের কেন্দ্রস্থল খুঁড়িয়া ভূ-গর্ভে একটি কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে রাজার শবাধারটি রাখিবার ব্যবস্থা হইত। উত্তর দিক হইতে এই লুক্কায়িত কক্ষে আসিবার গোপন পথ রাখা হইত। এই রাজকক্ষটি এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত হইত যে কয়েকজন অন্তরঙ্গ ব্যতীত অপর কেহ হাজার চেষ্টা করিলেও ঐ কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত

না। সেকালে মিশরপতিগণ অতি শক্তিশালী হইতেন এবং বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা জীবদ্দশায় যে সকল রত্নসম্ভার ব্যবহার করিতেন সেগুলিও এই কক্ষে রাখিয়া দেওয়া হইত, সেইজন্য এরূপ সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। এই সতর্কতার ফলে অনেকগুলি পিরামিডের রাজকক্ষ এখনও অলুণ্ঠিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই কারণেই তৎকালীন রাজকুলের অভ্যস্ত জীবনের পরিচয় আজ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

খুফুসের স্মৃতি-প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ রাজকক্ষে যাইতে হইলে তিনশত ফুট দীর্ঘ পথে ভূ-গর্ভে নামিয়া, একটি কক্ষে উপস্থিত হইবার পর খানিকটা উপরে উঠিলে তবে এই রাজকক্ষের ক্ষুদ্র দ্বারে পৌছান যায়। রাজকক্ষের উপরে পাঁচটি তলা নির্ম্মিত হইয়াছে। এইগুলির কোনটি রাণীর জন্য, আবার কোনটি আর কোন প্রিয়জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই ঘরগুলির মেঝে, সিলিং ও প্রাচীর নানা বর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময়।

এ পর্য্যন্ত কারিগরের কীর্ত্তিগুলির মধ্যে কি পরিকল্পনার বিশালতায়, কি প্রাচীনতায়, কি কারিগুরি কৌশলের নিপুণতায় বা কালের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টায়, খুফুসের পিরামিডটিই যে শ্রেষ্ঠতম সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই।

চলন্ত সোপান

আজকাল ঘন বসতিপূর্ণ নগরীর ৮০।৯০ ফুট নিম্নে ভূগর্ভে ট্রেণের ব্যবস্থা হওয়ায় যাত্রীদিগের উঠানামা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ সিঁড়ি দিয়া ৮০।৯০ ফুট প্রত্যহ উঠা নামা করা শিশু, নারী রোগী বা বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব নহে। লিফ্‌টে উঠা নামা করা কয়েক জনের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু সকলের পক্ষে উহাতে প্রয়োজনের সময় স্থান পাওয়া অসম্ভব। এবং উহা তত নিরাপদও নহে।

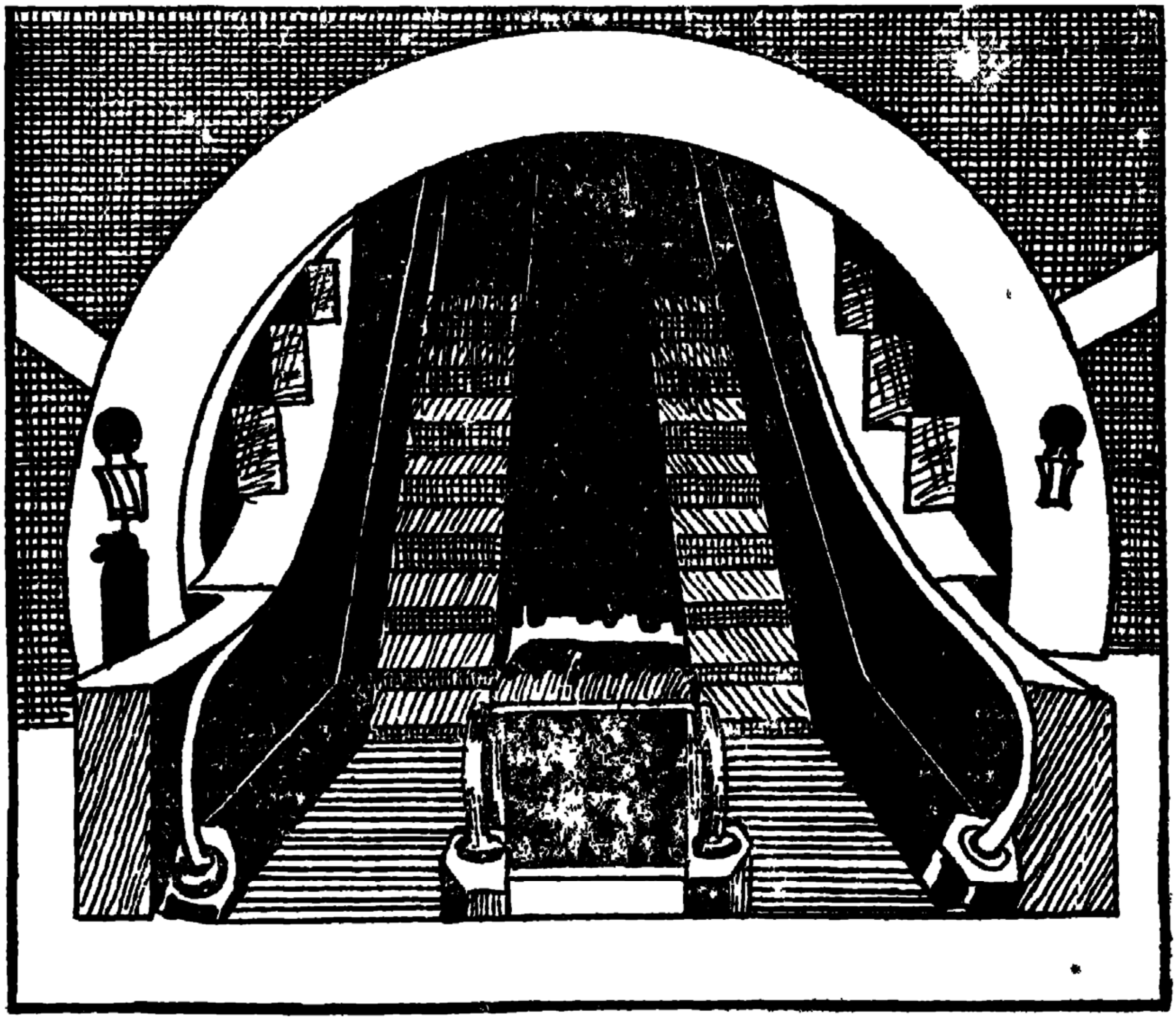

চলন্ত সোপান

কারিগর সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য চলন্ত সোপানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সিঁড়ির কোন পাদপীঠে দাঁড়াইয়া থাকিলেই হইল। উহা শক্তিশালী মোটরের সাহায্যে চলিতে থাকে। ভূগর্ভের রেল (Tube Railway)—প্লাটফরম্ হইতে উপরে আসিতে হইলে ঊর্দ্ধগতি সোপানে পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এইরূপে প্রতি পাদপীঠে যাত্রী দাঁড়াইয়া থাকিলেই কিছুক্ষণ পরে অভীষ্ট স্থানে গিয়া উঠিবে। নামিবার সময় কোন নিম্নগতি সোপানে পা দিয়া দাঁড়াইতে হয়। চলন্ত সিঁড়িগুলি এত নিরাপদ যে কখনও দুর্ঘটনা ঘটে না। প্রচুর আলোর ব্যবস্থা থাকায় সকল সময়েই দিন বলিয়া ভ্রম হয়।

লণ্ডন নগরীর ভূগর্ভের ট্রেণগুলিতে দৈনিক বিশ লক্ষ যাত্রী যাতয়াত করে, চলন্ত সিঁড়ি উদ্ভাবিত না হইলে সকল যাত্রীর পক্ষে ঐরূপ পথে যাতায়াত করা সম্ভবপর হইত না। চলন্ত সিঁড়ির ব্যবস্থা হওয়ায় যাত্রীগণ জানিতেই পারে না যে তাহারা উঠা নামা করিতেছে।

কলে কাপড় কাচা

ময়লা কাপড় এখন ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রায় কলেই কাচা হয়। পূর্ব্বে সোডা ও সাবানগোলা জলে কাপড় সিদ্ধ করা হইত। এখনও আমাদের দেশে ধোপারা তাই করে। জল ফুরাইয়া গেলে জল দিতে হয়, তাহা না হইলে কাপড় পুড়িয়া যাইবে। একটু অসাবধান হইলেই কাপড় পুড়িয়া যায়, এ আমাদের দেশের নিত্য ব্যাপার।

তাহার পর নদী বা জলাশয়ে গিয়া তক্তায় বা পাথরে ঐ সিদ্ধ কাপড় আছড়াইয়া, ময়লা ছাড়াইয়া, ধুইয়া ফেলা হয়। কাপড় আছড়াইলে বড় ছিঁড়িয়া যায়। যে ধোপার শরীরে যত জোর, সে তত কাপড় ছিঁড়িয়া

আনে আমাদের দেশে। সেইজন্য দুর্ব্বল বাঙ্গালী ধোপার অপেক্ষা সবল অন্য ধোপারা কাপড় ছিঁড়িয়া আনে বেশী।

আছড়াইবার পর ভাল করিয়া ধুইয়া গায়ের জোরে কাপড় নিংড়াইয়া জল বাহির করিয়া ফেলা হয়। তাহার পর নীল ও মাড় গোলা জলে পুনরায় ভিজাইয়া, নিংড়াইয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। অবশেষে শুষ্ক কাপড় ইস্ত্রি করা হয়।

এখন কারিগর বুদ্ধির বলে এই সেকালের প্রথায় আমুল পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। এখন বড় বড় ধোপার কারখানায় নিম্নলিখিত প্রথায় সাধারণতঃ কাপড় কাচা হয়।

কাপড়গুলি প্রথমতঃ ধুতি, সাড়ী, সার্ট, পাঞ্জাবী, গেঞ্জী, তোয়ালে ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করিয়া এক একটি তারের খাঁচায় ভরিয়া দেওয়া হয়। একটি বড় লোহার পিপাতে প্রয়োজন মত জল, সাবান ও সোডা গোলা হয়। এই পিপাটিকে অতি বেগে ঘুরাইবার ব্যবস্থা আছে। তাহার পর ধুতি, গেঞ্জী পূর্ণ তারের খাঁচাগুলি পিপার ঐ মসলার জলে ব্রাকেটে টাঙ্গাইয়া দিয়া পিপাটিকে অতি বেগে ঘুরান হয় এবং নিকটস্থ বয়লার (জল গরম করিবার পাত্র) হইতে নল দিয়া আনীত অতি তপ্ত বাষ্প ঐ ঘূর্ণায়মান পিপার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

গরম মসলার জলে ধূলি ও তেল আদি মসলা গুলিয়া যায় এবং পিপাটি অত্যন্ত জোরে ঘুরিতে থাকায় তপ্ত জলের ঝাপ্‌টা অত্যন্ত জোরে খাঁচাগুলির কাপড়ে গিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই উপায়ে কাপড় আছড়াইয়া কাচিবার অপেক্ষা ভাল কাজ হয়, অথচ কাপড় কম ছিঁড়ে। এই পিপার জল অত্যন্ত ময়লা হইয়া গেলে উহা বাহির করিয়া দিয়া পুনরায় পরিষ্কার জল দিবার ব্যবস্থা আছে। এইরূপে কাপড় কাচা হইয়া গেলে ঘন ঘন জল পরিবর্ত্তন করিয়া কাচা কাপড় ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলা হয়।

তাহার পর ঐ কাপড়গুলি হাতে না নিংড়াইয়া কলে নিংড়াইবার এক অতি সহজ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। কোন পাত্র জোরে ঘুরিতে থাকিলে কেন্দ্র-বিমুখী শক্তির (Centrifugal) বশে এই পাত্রস্থ

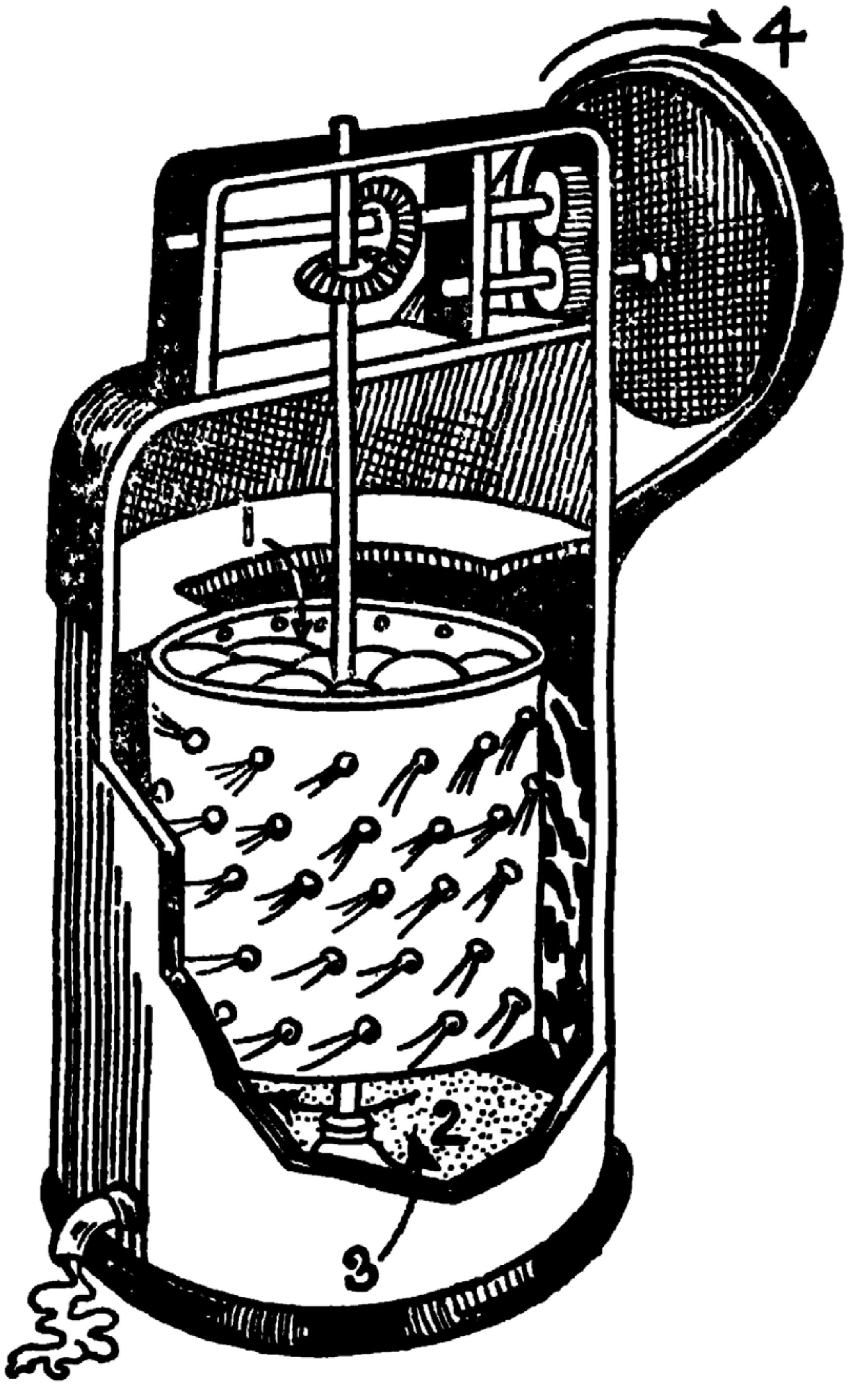

কাপড় নিংড়াইবার ব্যবস্থা

১। বড় পিপা ২। ছোট পিপা ৩। বড় পিপার তলদেশে ময়লা জল জমা হইয়াছে ৪। ফিতার সাহায্যে ছোট পিপাটি বেগে ঘোরান হইতেছে।

বস্তু পাত্র হইতে ছিটকাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে থাকে ; এই প্রাকৃতিক নিয়মের সুযোগ লইয়া কারিগর কাপড় নিংড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

একটি বড় পিপার মধ্যে আর একটি সহস্র ছিদ্র ছোট পিপা অতি বেগে ঘুরাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। কাঁচা কাপড়গুলি ছোট পিপার মধ্যে রাখিয়া উহাকে অত্যন্ত জোরে ঘুরান হয়। এই অতি ঘূর্ণিবেগের ফলে কাপড় ও কাপড়ের জলকণাগুলি ছিটকাইয়া পড়িতে চায়। কাপড়গুলি ছোট পিপার মধ্যে বদ্ধ থাকায় ছিটকাইয়া পড়িতে পায় না, কিন্তু উহার জলকণাগুলি পিপার অসংখ্য ছিদ্রমুখে বেগে বাহির হইয়া বড় পিপাতে গিয়া পড়ে। তাহার পর উহার তলদেশস্থ একটি নল দিয়া ঐ জল বাহির হইয়া যায়। এইরূপে আজকাল অতি সুন্দরভাবে কলে কাপড় কাচা ও নিংড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থায় কাপড় ছিঁড়ে না, মিহি কাপড়ের সূতা সরিয়া যায় না এবং কাচিবার ও নিংড়াইবার সময় ধোপা নির্ম্মমভাবে নিজের গায়ের জোর দেখাইবার সুযোগ না পাওয়ায় কাপড়ের আয়ু বাড়ে।

রেল ইঞ্জিনের জন্মকথা

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে খনি হইতে কয়লা বহন করিয়া আনিবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করা হইত। বন্ধুর পথে দেখা গেল ঘোড়া অল্প পরিমাণ কয়লাই টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য পথের বন্ধুরতা কমাইবার উদ্দেশ্যে দুটি সমান্তর লাইন কাঠের তক্তা পাতিয়া, উহার উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিবার ব্যবস্থা করিয়া দেখা গেল যে ঘোড়া অধিক পরিমাণে মাল দ্রুতগতি টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দেও এইরূপ চওড়া কাঠ পাতা পথে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া ডারহাম ও নরদাম্ল্যাণ্ডের খনিগুলি হইতে কয়লা নিকটস্থ নদীর ধারে আনিবার ব্যবস্থা করা হইত।

ক্রমশঃ দেখা গেল ভারী গাড়ীগুলির চাকার চাপে তক্তাপথ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তক্তার উপর লোহার পাত মুড়িয়া দেওয়া হইল। ইহাতে পথ দৃঢ় ও স্থায়ী হইল বটে, কিন্তু গাড়ীর চাকা চলিতে চলিতে, লোহার পাত মোড়া পিচ্ছল পথ ছাড়িয়া, কাঁচা পথে নামিয়া পড়িত। ইহাতে বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন গাড়ীর চাকা ঠিক পথে রাখিবার জন্য খাঁজ করা পথ করা হইল। এইরূপে পথের নানা অসুবিধা দূর করিতে গিয়া বর্ত্তমান লোহার রেল পাতা পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান রেলপথের আদি আবিষ্কর্ত্তা উইলিয়ম জেসপ্ (William Jessop)।

বর্ত্তমানে ভারী রেলগাড়ী অতি দ্রুত ছুটিবার জন্য যে রেলপথ পাতা হয় উহার প্রতিগজ রেলের ওজন একমণেরও অধিক। বিলাতে এই পথে ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে গাড়ী নিরাপদে ছুটিতে পারে।

এইরূপে পথের বন্ধুরতা বহুলাংশে দূর হওয়ায় গাড়ীর গতি বাড়িল ও ঘোড়ার মাল বহন করিবার শক্তিও বাড়িল। ইহার পূর্ব্বে হইতেই গভীর খাত হইতে কয়লা তুলিবার জন্য বা জল ছেঁচিয়া ফেলিবার জন্য বাষ্পীয় শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছিল, কিন্তু এই নবলব্ধ বাষ্পীয় শক্তিকে অশ্বের পরিবর্ত্তে লাগাইবার চেষ্টা তখনও সফল হয় নাই।

এই অভিনব চেষ্টায় প্রথম সফলকাম হন কুগনট্ (Cugnot) নামে একজন ফরাসী। এতবড় আবিষ্কারের ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার নির্ম্মিত ইঞ্জিন পথে ছুটিতে ছুটিতে একটি প্রাচীরে ধাক্কা লাগে; প্রাচীরটি পড়িয়া যায়, ইঞ্জিনটির বাষ্পাধার (boiler) ফাটিয়া যায় এবং কতকগুলি লোক আঘাতে মারা পড়ে। ফলে কুগনট্ গেলেন কারাগারে এবং তাঁহার অদ্ভুত যন্ত্রটি গুদামে তালাবদ্ধ হইল। ইহাকেই বলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা!

তাহার পর রিচর্ড ট্রেভিথিক (Richard Trevithick) নামে এক ব্যক্তি কর্ণওয়ালে (Cornwall) একটি কার্য্যকর ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন এবং উহা লণ্ডনে লইয়া গিয়া চালান। এক্ষেত্রেও ভাগ্যের প্রতিকুলতায় লণ্ডনবাসীগণ এইরূপ অভিনব আবিষ্কারে কোনরূপ উৎসাহ বা কৌতুহল দেখাইল না।

দৈবের বিধানে আর একজন বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগ আবিষ্কারের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন। তাঁহার নাম জর্জ্জ ষ্টিফেন্সন্ (George Stephenson); একজন দরিদ্র কয়লা খনির কুলির সন্তান তিনি। শৈশবে তিনি পলাইয়া বেড়াইতেন। পিতার দারিদ্র্যের জন্য শৈশবে কিছু লেখাপড়াও শিখিতে পারেন নাই। সেকালে ধনী ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে লেখাপড়া শেখা ঘটিত না।

বাল্যকালে তিনি গরু চরাইয়া দৈনিক ছয় পয়সা রোজগার করিতেন। এ কাজও বেশী দিন রহিল না। কিছুদিন বেকার থাকিবার পর তিনি এক কয়লার খনিতে দৈনিক নয় আনা পারিশ্রমিকে চাকুরী পাইলেন। কয়লাখনির মুখে যে ইঞ্জিনের সাহায্যে কয়লা তোলা বা লোক নামানা হইত, সেই ইঞ্জিনে কয়লা দিবার কাজে তিনি নিযুক্ত হইলেন।

খাটুনি অসম্ভব, কিন্তু তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এই প্রথম তিনি দেখিতে পাইলেন, কেমন করিয়া বাষ্পীয় শক্তির দ্বারা কাজ করান যাইতে পারে। ক্রমশঃ তিনি আঠার বৎসর বয়সে ইঞ্জিন চালাইবার ভার পাইলেন।

এতদিনে তিনি শিক্ষার অভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি দিনে চাকুরী করিতেন এবং সন্ধ্যায় লেখাপড়া শিখিবার জন্য এক শিক্ষকের পাঠশালায় যাইতে লাগিলেন। এই সামান্য লেখা পড়া শিখিবার জন্য তাঁহাকে সপ্তাহে পাঁচ আনা গুরুদক্ষিণা দিতে হইত। আর এক শিক্ষক দয়া করিয়া তাঁহাকে অঙ্ক শিখাইতেন।

প্রাণপণ যত্ন ও সাধনায় কিছু দিনেই জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিল। ফলে ইঞ্জিন চালাইতে চালাইতে যে সকল ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করিলেন, সেইগুলি দূর করিয়া তিনি এক অভিনব ইঞ্জিনের পরিকল্পনা দাঁড় করাইলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে গাড়ী টানা ইঞ্জিনের তিনি এক নক্সা করিলেন। খনির মালিকেরা তাঁহাকে এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যথেষ্ট টাকা দিলেন। ইঞ্জিন গড়িবার কারিগরের অভাব, যন্ত্রের অভাব, মাল মসলার অভাবের ত কথাই নাই। সেকালের গ্রাম্য কামারের যন্ত্রাদি দিয়া তিনি বহু আয়াসে এবং এক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় একটি ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিলেন।

তাঁহার প্রথম ইঞ্জিন কার্য্যকর হইলেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আর একটি পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিলেন। নদী হইতে দূরবর্ত্তী পশ্চিম ডারহামের (Durham) খনিগুলি হইতে কাটা কয়লা নদীতে সহজে আনিবার জন্য রেলপথ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব এই সময়ে উঠিল। তিনি প্রস্তাবটি শুনিতে পাইয়া ডার্লিংটনে (Darlington) উপস্থিত হইলেন এবং এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার যিনি ভার লইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। তিনি এবিষয়ে নিজে এক নূতন প্রস্তাব উক্ত কার্য্যের কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এডওয়ার্ড পিজের (Mr. Edward Pease) নিকট উপস্থিত করায়, মিঃ পিজ্ তাঁহাকে ঐ কাজের প্রধান কারিগরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ষ্টিফেন্সন্ নিজের সঞ্চয়ের অধিকাংশ দিয়া এবং কিছু টাকা ধার করিয়া নিউকাশল্‌এ (New Castle) এক কারখানা করিলেন। বলিতে গেলে, এই কারখানাই পৃথিবীর প্রথম ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা।

রেলপথ পাতা হইল। প্রথম ইঞ্জিন 'লোকোমোশন' (Locomotion) নির্ম্মিত হইল। উহার গাড়ীগুলিও নির্ম্মিত হইল। স্থির হইল ২৭ শে

সেপ্টেম্বর ১৮২৫ খৃঃ এই নূতন 'লোকমোশন' তাহার গাড়ীগুলিকে প্রথম টানিয়া লইয়া যাইবে। এই অভিনব পরীক্ষার যাঁহারা ভার লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের এই নূতন কার্য্যের উত্তেজনায় কয়েক রাত্রি নিদ্রাই ছিল না।

'লোকমোশনের' পিছনে এক সারি গাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হইল, ষ্টিফেন্সন্ নিজের কারখানায় গড়া ইঞ্জিনে উঠিয়া, উহা নিজেই চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বহু ব্যক্তি কৌতূহল ভরে গাড়ীগুলিতে চড়িলেন। এক বিশাল জনতা মজা দেখিবার জন্য রেলপথের দুইপাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদিগের উল্লাস ও উৎসাহ ধ্বনিতে দিক্‌বিদিক্ পূর্ণ হইল। একজন অশ্বারোহী ইঞ্জিনের সম্মুখে লাল পতাকা হস্তে ছুটিতে থাকিবে বলিয়া প্রস্তুত হইল।

ষ্টিফেন্সন্ অশ্বারোহীকে ইঙ্গিত করিয়া গাড়ী ছাড়িলেন। ক্রমশঃ গাড়ীগুলি চলিতে চলিতে যখন ছুটিতে আরম্ভ করিল তখন সমবেত জনতা যে আনন্দধ্বনি করিল তাহার তুলনা নাই। ষ্টিফেন্সনের পরীক্ষা আজ সফল হইল।

তখন রেলপথে ঘোড়ার গাড়ীর চলন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। উল্লিখিত ঘটনার চারি বৎসর পরে লিভারপুল ও ম্যান্‌চেষ্টারের মধ্যবর্ত্তী রেলপথের মালিকেরা গাড়ী টানিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য প্রায় আট হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। ষ্টিফেন্সন তাঁহার বিখ্যাত "রকেট" (Rocket) নামক ইঞ্জিন তৈয়ারী করিয়া এই পুরস্কার লাভ করিলেন। এই ইঞ্জিনটি তাঁহার পূর্ব্ব ইঞ্জিনগুলির এক উন্নত সংস্করণ। রেলপথের উপর দিয়া ভীষণভাবে দুলিতে দুলিতে 'রকেট' পিছনের গাড়ীগুলি লইয়া ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করিল। সে যুগে এইরূপ বেগে ছুটা একটা পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার ছিল; ইতিপূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার কেহ শোনেও নাই।

লোকের ধারণা ছিল ঐরূপ বেগে ছুটিলে গাড়ীর লোকগুলি নিশ্বাস লইতে পারিবে না এবং দম বন্ধ হইয়া মারা যাইবে। কিন্তু লোকের

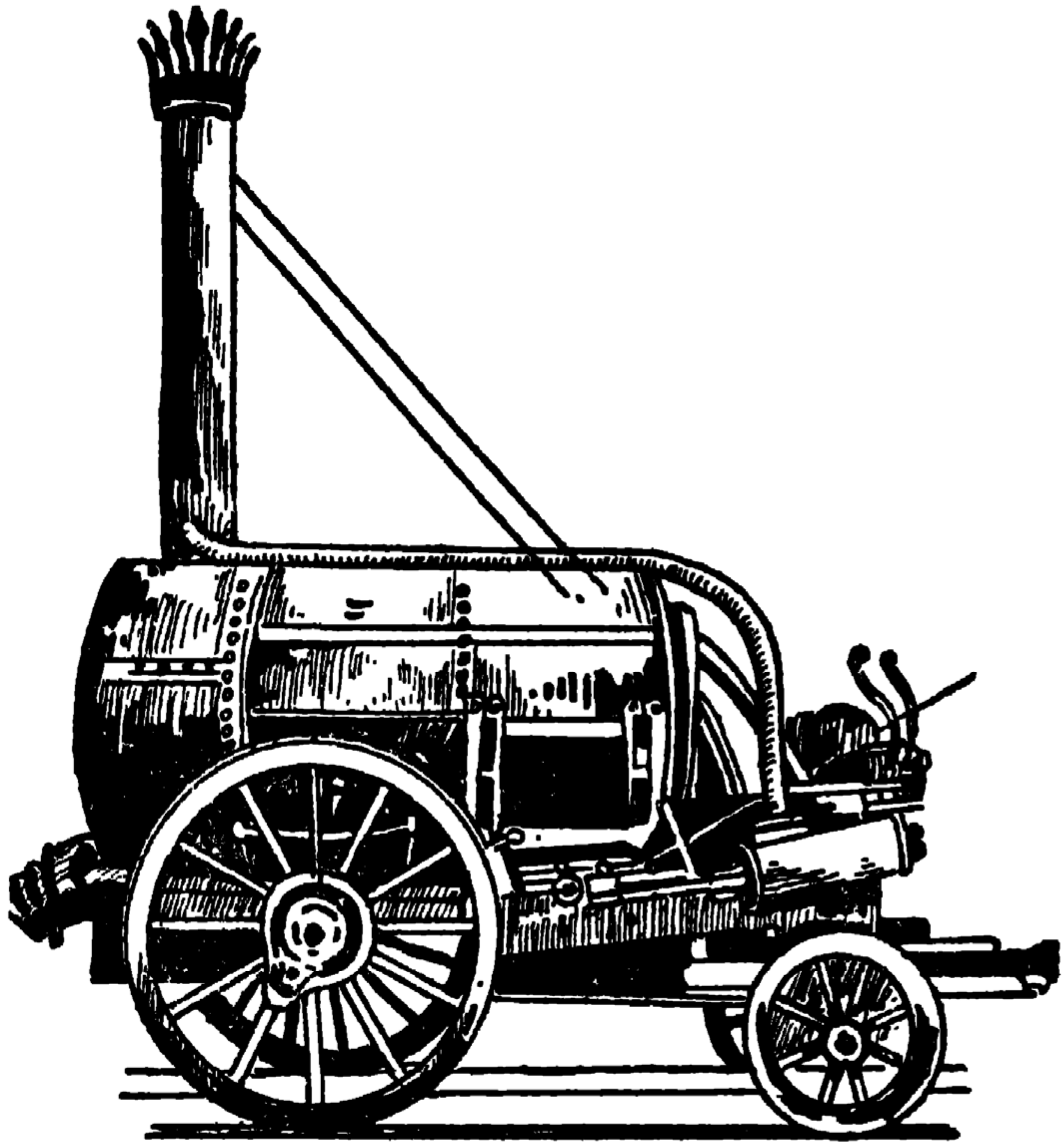

ষ্টিফেনসনের ‘রকেট’

সাধারণ বিশ্বাসে টলিবার পাত্র তিনি ছিলেন না। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ও বাষ্পীয় শক্তিতে অটল বিশ্বাসের জন্য জগতে দ্রুতগতি ও রেলপথের প্রবর্ত্তন হইল।

কারিগরের সেরা কীর্ত্তি

শক্তির মূলে সংযম। শৃঙ্খলিত ও সংযত করিলে শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বম্পীয় শক্তিকে শৃঙ্খলিত ও সংযত করিয়া কারিগর উহাকে অক্লান্তভাবে খাটাইতে পারে। বাষ্পীয় শক্তিকে যন্ত্রে পুরিয়া খাটাইয়া লওয়া কারিগরের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিলেই চলে। বর্ত্তমান সভ্যতা এই এক শক্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইয়োরোপ যে আজ এত দুর্দ্ধর্ষ তাহার কারণ—বাষ্পীয় শক্তির সাধনা।

বহুদিনই কোন কোন মনীষীর মাথায় বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগাইবার কথা খেলিয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ শক্তিকে যন্ত্রে পুরিয়া খাটাইবার রীতিমত চেষ্টা প্রথম করেন জেমস্ ওয়াট্ (James Watt) অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

বাষ্পীয় যন্ত্রের মোটামুটি তিনটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম অংশ— চুল্লী, এইখানে কয়লা পুড়িয়া তাপে পরিণত হয়। ২য় অংশ—বাষ্পপাত্র, এই স্থানে জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। ৩য় অংশ—সিলিণ্ডার, এইটির সাহায্যে শৃঙ্খলিত বাষ্পীয় শক্তি কার্য্য করে।

১ম, চুল্লী

ইহার প্রধান অংশ চতুষ্কোণ কুণ্ডে (Fire box) কয়লা জ্বলিয়া তাপ সৃষ্টি করে। এই অগ্নিকুণ্ডের তলদেশে বহু ছিদ্র থাকায় ছাই ও কয়লার ছোট টুকরাগুলি নীচে ছাই গাদায় পড়িয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। অগ্নিকুণ্ডের একটি. ছোট কপাট খুলিয়া মাঝে মাঝে কয়লা দেওয়া হয়। চিত্রের ১ চিহ্নিত স্থান ছাইগাদা এবং ২ চিহ্নিত স্থান অগ্নিকুণ্ড। ধোঁয়া আকাশে বাহির হইয়া যাইবার জন্য একটা চিমনি থাকে।

২য়, বাষ্পপাত্র

বর্ত্তমানে ইহার অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা মুখচাপা জলের

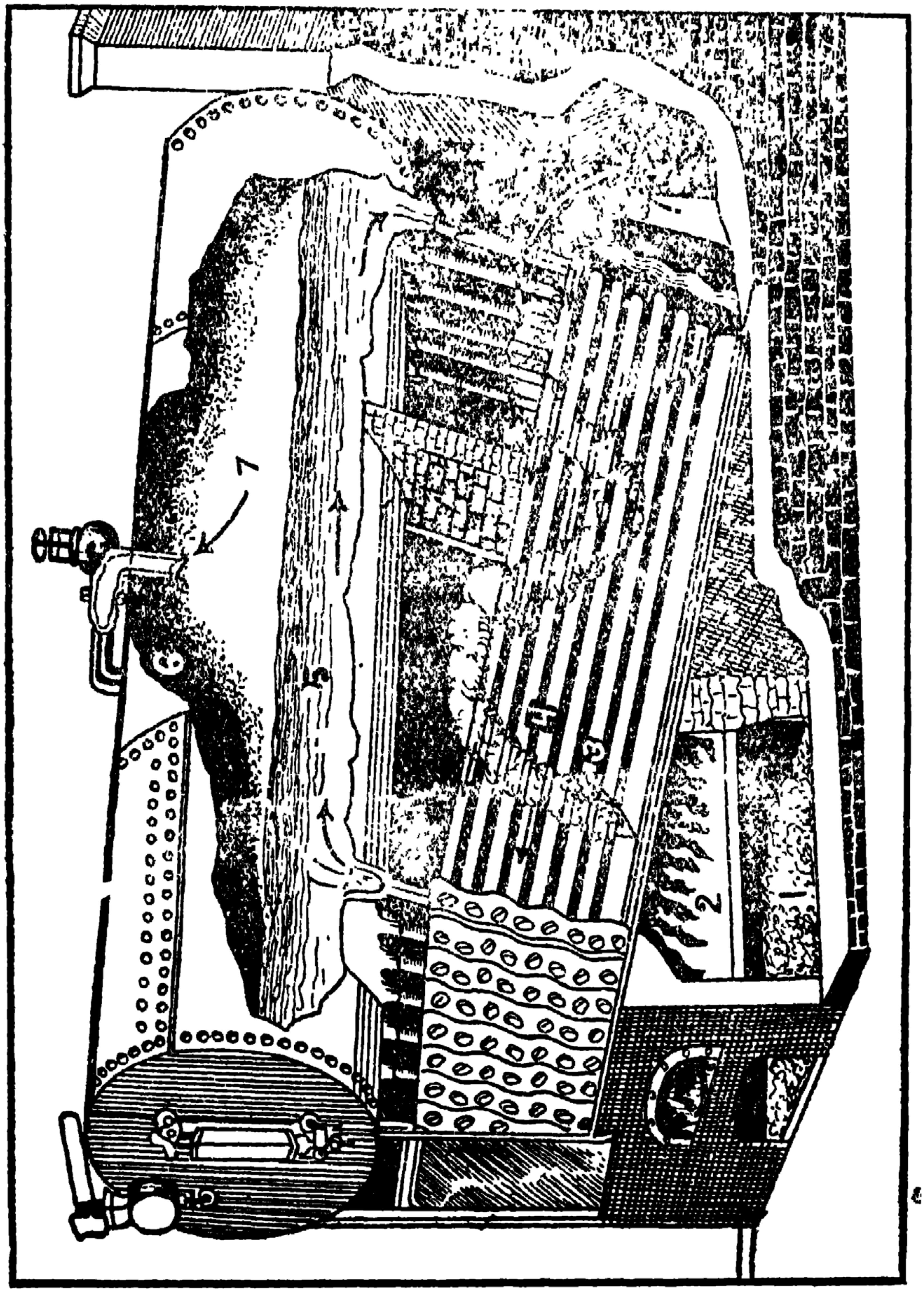

সাধারণ পাত্রই হইত। ইহাতে বাষ্পপাত্রের চারিটি পাশের মধ্যে মাত্র তলদেশে তাপ পায়। কোন প্রকারে চারিদিকেই যদি তাপ লাগিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে খুব অল্প সময়েই জল বাষ্পে পরিণত হইবে এবং সব তাপটুকুই কাজে লাগিবে। সেইজন্য বর্ত্তমানে ইহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম অংশ আংশিক জলে পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয় অংশ কতকগুলি নলের সমষ্টি মাত্র। এই অংশ উপরের অংশ হইতে অগ্নিকুণ্ডের উপর ঝুলিতে থাকে। উপরের জলপাত্র হইতে জল কয়েকটি পথে নলগুলির মধ্যে নামিয়া আসে এবং বাষ্পে পরিণত হইয়া আবার কয়েকটি মুখ দিয়া জলপাত্রে প্রবেশ করিয়া জলপাত্র পুর্ণ করে। এই ব্যবস্থায় বাষ্পপাত্র সম্পূর্ণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকায় সকল দিকেই তাপ পায়। চিত্রের ৩ ও ৪ চিহ্নিত অংশ দুইটি বাষ্পপাত্রের নলগুলি অগ্নিকুণ্ডে ঝুলিতেছে। ৫ চিহ্নিত অংশটী জলপাত্র। ৬ অঙ্কিত স্থান বাষ্প এবং ৭ চিহ্নিত নল দিয়া মাঝে মাঝে শীতল জল, প্রয়োজন হইলে, জলের ট্যাঙ্ক হইতে ভরিয়া লওয়া হয়। উপরে যে চিত্র দেওয়া হইল উহা স্থাণু যন্ত্রের, সেইজন্য ইঁটের গাঁথুনি দেখান হইয়াছে।

কোন কোন বাষ্পধারে ঐ নলগুলির মধ্য দিয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নি শিখা প্রবেশ করে এবং নলে নলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চিমনি দিয়া সধুম শিখা বাহির হইতে থাকে। এই নলগুলি জলপাত্রে ডুবিয়া থাকে, ফলে জল নলস্থ অগ্নিশিখার সংস্পর্শে আসিয়া বাষ্পে পরিণত হয়।

৩য়, সিলিণ্ডার অংশ

এই অংশে বাষ্পশক্তি কারিগরের কলে পড়িয়া, তাহার ইচ্ছামত খাটিতে বাধ্য হয়। ১ম চিত্রের ৭ চিহ্নিত পথে বাষ্পপাত্র হইতে বাষ্প

৮ চিহ্নিত কুঠরিতে আসিয়া প্রবেশ করে। তাহার পর ৬ চিহ্নিত মুখ খোলা পাইয়া ঐ মুখে ৫ চিহ্নিত সিলিণ্ডারের মধ্যে বেগে প্রবেশ

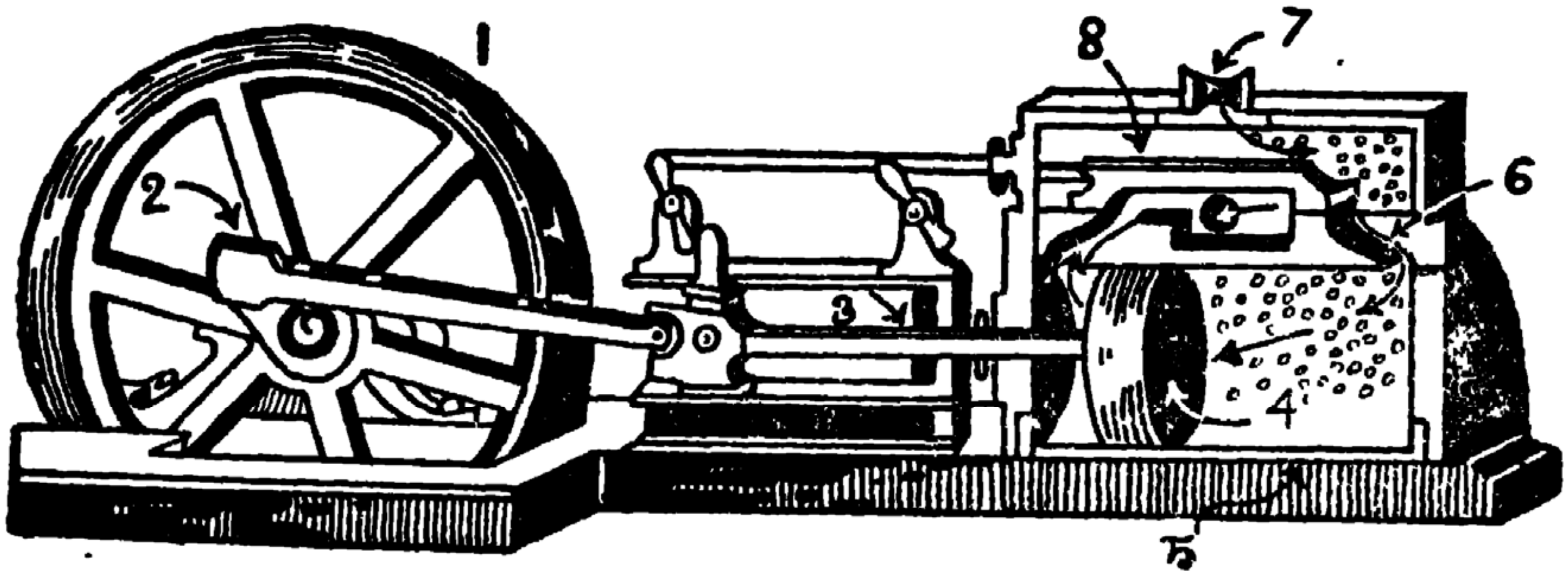

১ম চিত্র

করে। এই সিলিণ্ডারের মধ্যে ৪ চিহ্নিত একটি চাকতি এমনভাবে আঁটা আছে, যে উহা বাষ্পের চাপে সিলিণ্ডারের মধ্যে আনাগোনা করিতে পারে; অথচ উহার এক পিঠের বাষ্পরাশি উহার ধার দিয়া অপর পিঠে যাইবার পথ পায় না। এই চাকতির (Piston) অপর পিঠে ৩-চিহ্নিত একটি দণ্ড সংযুক্ত আছে। বাষ্পের ঠেলায় যখন পিষ্টনটি আনাগোনা করে, তখন উহা একবার সিলিণ্ডারের বাহিরে যায় এবং পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করে। পিষ্টন-দণ্ডটির এইরূপ আনাগোনার ফলে ১ চিহ্নিত একটি বৃহৎ চাকা (Fly Wheel) ৩ চিহ্নিত ক্র্যাঙ্কের সাহায্যে সমান বেগে ঘুরিতে থাকে। এই চাকাটির ঘূর্ণনের সহিত নানা যন্ত্র চালাইয়া কারিগর নানা কাজ আদায় করে।

প্রথমচিত্রে বাষ্প-কুঠরি হইতে বাষ্প ৬ চিহ্নিত সিলিণ্ডারে প্রবেশ করিয়া পিষ্টনটিকে বাহিরের দিকে ঠেলিতে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে পিষ্টনের অগ্রগতির সহিত উহার দণ্ডটিও বাহিরে ছুটিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমান্তর দণ্ড ৮ চিহ্নিত বাষ্প-কুঠরিতে বেগে প্রবেশ

করে। ইহার সহিত একটি চলন্ত কপাট আঁটা আছে। এই দণ্ডটি ভিতরে প্রবেশ করিলে ঐ কপাটটি আসিয়া ৬ চিহ্নিত মুখটি চাপিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এই বাষ্পকুঠরি হইতে বাষ্পের সিলিণ্ডারে প্রবেশ করিবার

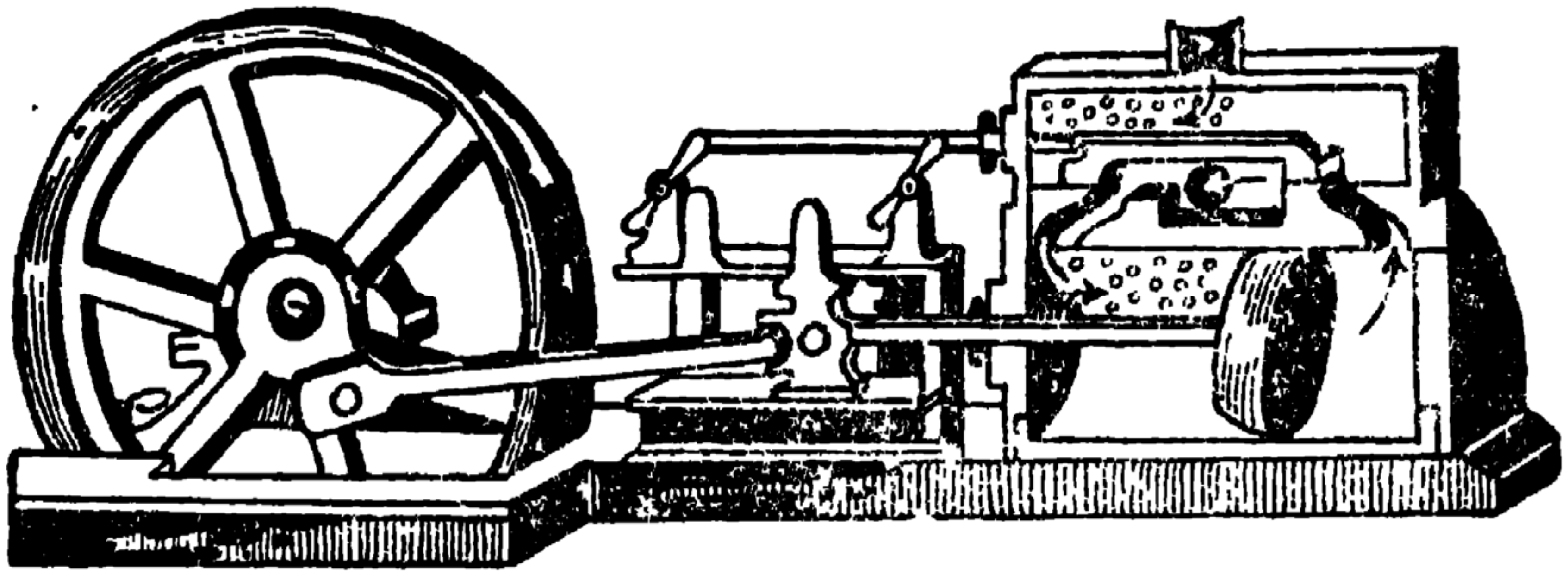

২য় চিত্র

দুইটি মুখ আছে। এমন কৌশলে ঐ কপাটটি নির্ম্মিত যে ৬ চিহ্নিত মুখটি বন্ধ হইয়া গেলে অপর মুখটী খুলিয়া যায়। তখন এই মুখে বাষ্পরাশি কুঠরি হইতে সিলিণ্ডারে প্রবেশ করে এবং পিষ্টনটিকে বিপরীত দিকে ঠেলিতে থাকে। ইহার ফলে পিষ্টনদণ্ডটি বেগে ভিতরে প্রবেশ করে এবং উহার সমান্তর দণ্ডটি বেগে বাহিরে আসে। এই দণ্ডটির সহিত সংযুক্ত কপাটটি তখন সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দিকে সরিয়া আসিয়া ৬ চিহ্নিত মুখটি খুলিয়া দেয় এবং অপর মুখটি বন্ধ করে।

এইরূপে বাষ্পের সাহায্যে ক্র্যাঙ্কটিকে অগ্রপশ্চাৎ চালাইয়া একটি ফ্লাই-হুইল সমানবেগে ঘুরান হয়। ফ্লাই-হুইলের ঘুর্ণনের ফলে ক্র্যাঙ্কের রৈখিক-গতি (Linear motion) ঘুর্ণি-গতিতে (Circular motion) পরিণত হয়। ঘুর্ণি-গতি সমান তালে ও বেগে চলে বলিয়া উহার সাহায্যে ভাল কাজ পাওয়া যায়।

ভূগর্ভে রেলপথ

প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ তাহার নানা প্রয়োজনের বশে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ কাটিয়া পথ করিয়া লইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েক স্থানেও ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ পথের পরিচয় পাই। ভারতে এখনও কয়েক স্থানে প্রাচীন সুড়ঙ্গ পথের অবশিষ্টাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লী ও আগ্রা দুর্গদ্বয়ের মধ্যে যমুনার পাশে পাশে ৯০ মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ ছিল। আগ্রা দুর্গ হইতে তাজমহল পর্য্যন্ত আর একটি সুড়ঙ্গ পথের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি পথের মুখ ইংরাজ বাহাদুর গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেকালে দীর্ঘ খানা কাটিয়া উহার মেঝে, দুইপাশ ও ছাদ ইট দিয়া গাঁথিয়া সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করা হইত। তাহার পর ছাদের উপর মাটি ফেলিয়া চারিপার্শ্বের ভূমির সহিত সমতল করিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ উপায়ে কিন্তু ভূগর্ভের গভীরতর প্রদেশে সুড়ঙ্গ পথ করা সম্ভব ছিল না।

লণ্ডনে প্রথমে ভূগর্ভে রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার সময় কারিগরেরা অনুরূপ উপায়ে সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করেন। আজকাল এক নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ায় সুড়ঙ্গ পথ করা পূর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য হইয়াছে।

এই কৌশল উদ্ভাবন করেন মার্ক ইসাম্‌বাদ ব্রুনেল (Marc Isambad Brunel) নামে এক ফরাসী ওস্তাদ কারিগর। এই কৌশল অবলম্বনে তিনি বিলাতের টেম্‌স্‌ নদীর তলদেশে এক সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করেন এবং এক তীর হইতে অপর তীরে হাঁটিয়া যাইবার পথ সুগম করেন।

৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন নগরীতে ১৫ লক্ষ লোকের বাস ছিল

আজ সেই স্থানে ৮০ লক্ষ লোকের বাস। লণ্ডনের ক্ষেত্রফল প্রায় ৭০০ বর্গ মাইল। বড় বড় কারখানা আপিস, ব্যাঙ্ক, বিপণি, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি নানাবিধ বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠায় সেখানে লোকের বাস দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। দিনে লক্ষ লক্ষ লোক লণ্ডন নগরীতে কার্য্যোপলক্ষে যাতায়াত করে। পথ ও রথের বিশেষ উন্নতি হওয়ায় এই অসংখ্য লোকের যাতায়াত করিবার সুবিধা হইয়াছে।

পূর্ব্বে পাকা রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি করিয়া লোকে যাতায়াত চলিত। তাহার পর রেল পথের ব্যবস্থা হওয়ায় রেলপথে ঘোড়া, গাড়ি টানিয়া, ছুটিতে লাগিল। উহার পরে বাষ্পীয় শক্তি গাড়ী টানার জন্য ব্যবহৃত হওয়ায়, ঘোড়ার স্থানে ইঞ্জিনের ব্যবহার আরম্ভ হইল।

লণ্ডন জনবহুল হইবার বহু পূর্ব্বের সঙ্কীর্ণ পথগুলি দিয়া ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় লোক যাতায়াত করিতে থাকায়, সময়ে সময়ে যানবাহন ও মানুষের ভিড়ের চাপে পথ রুদ্ধ হইয়া, লোক চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন লোকের দৃষ্টি ভূগর্ভ পথের দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইল।

প্রথমে খানা কাটিয়া রেলপথ করা হইত; তাহার পর খানার মাথায় ছাদ গাঁথিয়া এবং উহার উপরে মাটি চাপা দিয়া ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মিত হইত। এইরূপ বদ্ধ সুড়ঙ্গ পথে কিন্তু সকল সময়েই ইঞ্জিন হইতে নির্গত ধূম ও বাষ্প মিলিয়া ঘন কুয়াসার সৃষ্টি করিত। তাহার পর বিজলী শক্তির প্রচলন হওয়ায় ভূগর্ভে যাতায়াত আজকাল অতি সুখকর হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভূগর্ভে রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার জন্য সুড়ঙ্গ কাটার রীতিরও বহু উন্নতি সাধিত হওয়ায় লণ্ডনের ৯০ ফুট ভূ-নিম্নে প্রায় ৬০ মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সুড়ঙ্গ পথগুলির মধ্যে দীর্ঘতম সুড়ঙ্গটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫ মাইল।

এইবারে ব্রুনেল উদ্ভাবিত কৌশলের কথা বলিব। প্রথমে খনিগর্ভে নামিবার মত একটি কূপ কাটা হয়। এইরূপ ৮০।৯০ ফুট গভীর কূপ খনন করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে ভূগর্ভে নামিবার পথ করা হয়। এই পথে লিফ্‌ট্‌ (Lift) সাহায্যে নামিয়া শ্রমিকেরা প্রয়োজন মত

ব্রুনেল সাহেবের উদ্ভাবিত উপায়ে সুড়ঙ্গ কাটা হইতেছে

সুড়ং কাটিতে আরম্ভ করে। যে স্থলে পূর্ব্বে ইঁটের খিলান ও প্রাচীর গাঁথিয়া সুড়ঙ্গ স্থায়ী ও নিরাপদ করা হইত, সে স্থলে টুক্‌রা টুকরা মোটা লোহার পাতে সুড়ঙ্গ পথ মুড়িয়া দেওয়া হয়। মাপ করা টুকরা পাতগুলি দিয়া আঁটিয়া দিলে, মিলিত লোহার টুকরাগুলি এমন একটি বৃহৎ সাধারণ লোহার নলে পরিণত হয়; যাহার নিম্নদেশ গোল না হইয়া হয় সমতল। এই লোহার টুকরাগুলি সমান মাপে কাটা ও ছেঁদা করা। সুড়ঙ্গ সামান্ত কাটা হইলেই

কারিগর প্রয়োজনমত লোহার পাতগুলি, একটির সহিত আর একটি, জুড়িয়া দিয়া নলটী ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকেন।

এই দৃঢ় লোহার নলের মধ্যে থাকিয়া মজুরেরা মাটি কাটিয়া চলে এবং ক্রমশঃ সুড়ঙ্গ পথ দীর্ঘ হইতে থাকে। এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান নলের ভিতর থাকিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া ব্রূনেল সাহেব সর্ব্বপ্রথম টেম্‌স্‌ নদীর তলদেশ দিয়া মানুষের হাঁটা পথ নির্ম্মাণ করেন।

আজকাল এই সুড়ঙ্গ-কাটা নলের বহুপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে। লণ্ডনের তলদেশে এঁটেল মাটি পাওয়া যায়। এইরূপ স্থলে লোহার নলের মুখে মাটি কাটা চক্র থাকে। এই চক্রটী অতিশয় বেগে ঘুরিয়া মাটি কাটিয়া পথ করিলে, নলটীকে যান্ত্রিক শক্তিবলে নূতন কাটা-পথে একটু ঠেলিয়া দেওয়া হয়; এবং পিছনের দিকে পূর্ব্ব-বর্ণিত উপায়ে টুকরা টুকরা লোহার পাত আঁটিয়া দিয়া নলটীকে দীর্ঘ করা হয়।

এঁটেল মাটির স্তরে জল না থাকায় এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব; কিন্তু যে স্তরে বালি, কাঁকর বা পাথরের নুড়ি পাওয়া যায়, সে স্তরে মাটি কাটিতে কাটিতে হঠাৎ তোড়ে জল উঠিয়া শ্রমিকদিগের জীবন বিপন্ন হইতে পারে এবং কাটা সুড়ঙ্গ পথ জলে ভরিয়া উঠিতে পারে; সেইজন্য এইরূপ স্তরে অন্য এক কৌশল অবলম্বন করা হয়। নদীতে পুলের ভিত্তি গাঁথিবার সময় যেরূপ লৌহকূপে অধিক চাপে বায়ু পুরিয়া দিয়া নদীর জল ঢুকিতে দেওয়া হয় না, সেইরূপ সুড়ঙ্গ কাটিবার সময় নলপথে অধিক চাপে বায়ু পাম্প করিবার ব্যবস্থা এইরূপ ক্ষেত্রে করা হয়।

কোথাও সুড়ঙ্গ কাটিতে হইলে উভয় দিক হইতে কাটিতে আরম্ভ করা হয়। তাহার পর উভয় দিক হইতে কাটিতে কাটিতে মাঝে আসিয়া কারিগরেরা মিলিত হয়। আজকাল দিক্‌-নির্ণয় যন্ত্রের উন্নতি

হওয়ায় ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ পথ উভয় দিক হইতে কাটিতে কাটিতে আসিলেও দিক্‌ভ্রম হয় না ; ঠিক দুইটী সুড়ঙ্গ এক স্থানেই আসিয়া মিলিত.হয়।

লণ্ডনের ভূগর্ভের গাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে কোন ষ্টেশনে থামিলে গাড়ীর দরজাগুলি আপনি খুলিয়া গিয়া যাত্রীদিগের উঠিবার নামিবার পথ করিয়া দেয়। দরজা খোলা বা বন্ধ করা গার্ডের গাড়ীর মধ্যে স্থিত একটি সুইচের উপর নির্ভর করে।

নগরের যে স্থানে ভূগর্ভে নামিলে টিউব রেলপথের ষ্টেশন পাওয়া যাইবে, সেই স্থানের ষ্টেশন বাড়িটীর উপর একটী সন্ধানী আলোক শিখা (Searchlight) পড়িয়া যাত্রীদিগকে অন্ধকারে পথ দেখায়। যাত্রীগণ নগরীর কোন পথের ধারে এইরূপ ষ্টেশন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গন্তব্য স্থানের টিকিট কেনেন। আমাদের দেশের মত লোকে টিকিট বিক্রয় করে না। প্রতি ষ্টেশনে যাইবার টিকিট বিক্রয়ের জন্য কয়েকটী যন্ত্র দাঁড় করান আছে। সেই যন্ত্রে টাকা দিলেই গন্তব্য স্থলের টিকিট ও বাকি পয়সা ফেরত পাওয়া যায়। তাহার পর বিশাল চলন্ত সোপানে পা দিলেই কিছুক্ষণের মধ্যে এক পা না চলিয়াই টিউব ষ্টেশনে পৌছান যায়।

ষ্টেশনে কয়েক মিনিটের পর পর ট্রেণ পাওয়া যায়। প্রতি ট্রেণে তিন হইতে ছয়খানি ছোট ছোট কামরা থাকে। যেমন ষ্টেশনগুলি শুষ্ক, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল আলোক মালায় বিভূষিত, গাড়ীগুলিও সেইরূপ। ধোঁয়া ও কুয়াসায় ঢাকা অন্ধকার পথ হইতে নিম্নে টিউব ষ্টেশনে নামিলেই মনে হয়, যেন মুহূর্ত্তে যাদুবলে মায়াপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সেখানের সকল ব্যবস্থাই যন্ত্রকৌশলের উপর নির্ভর করে। এই যন্ত্রগুলির কার্য্যকরী শক্তি দেখিলে উহাদিগকে মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়।

লণ্ডনের ভূগর্ভ রেলপথে ২০০০ গাড়ী দিনরাতি ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯৪টি ষ্টেশনে ১৭১ টি লিফ্‌ট ও ৮৫ টি বিশাল চলন্ত সোপান অবিরাম যাত্রীদিগকে পাতালপুরী হইতে উপরে লইয়া যাইতেছে এবং উপর হইতে পাতালপুরীতে নামাইয়া দিতেছে। এই দীর্ঘ পথ ও ষ্টেশনগুলির ১০১,০০০ বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোকে মনে হয় না যে লোকে পাতাল পুরীতে চলাফেরা করিতেছে। এই ভূগর্ভের রেলপথগুলি স্বাস্থ্যকর রাখিবার জন্য অবিরাম অশুদ্ধ বায়ুরাশি যন্ত্রে টানিয়া লইয়া বিশুদ্ধবায়ু যোগান দেওয়া হইতেছে।

কোন খেলা ধূলা বা কোন উৎসব উপলক্ষে যখন যাত্রীর ভিড় বাড়ে, তখন প্রতি দেড় মিনিট অন্তর একটি করিয়া ট্রেন ছাড়ে। এক গোলডারস্ গ্রীন্ (Golders Green) নামক ষ্টেশনেই বৎসরে ১৬,০০০,০০ যাত্রী গাড়ী হইতে নামে বা গাড়ীতে উঠে।

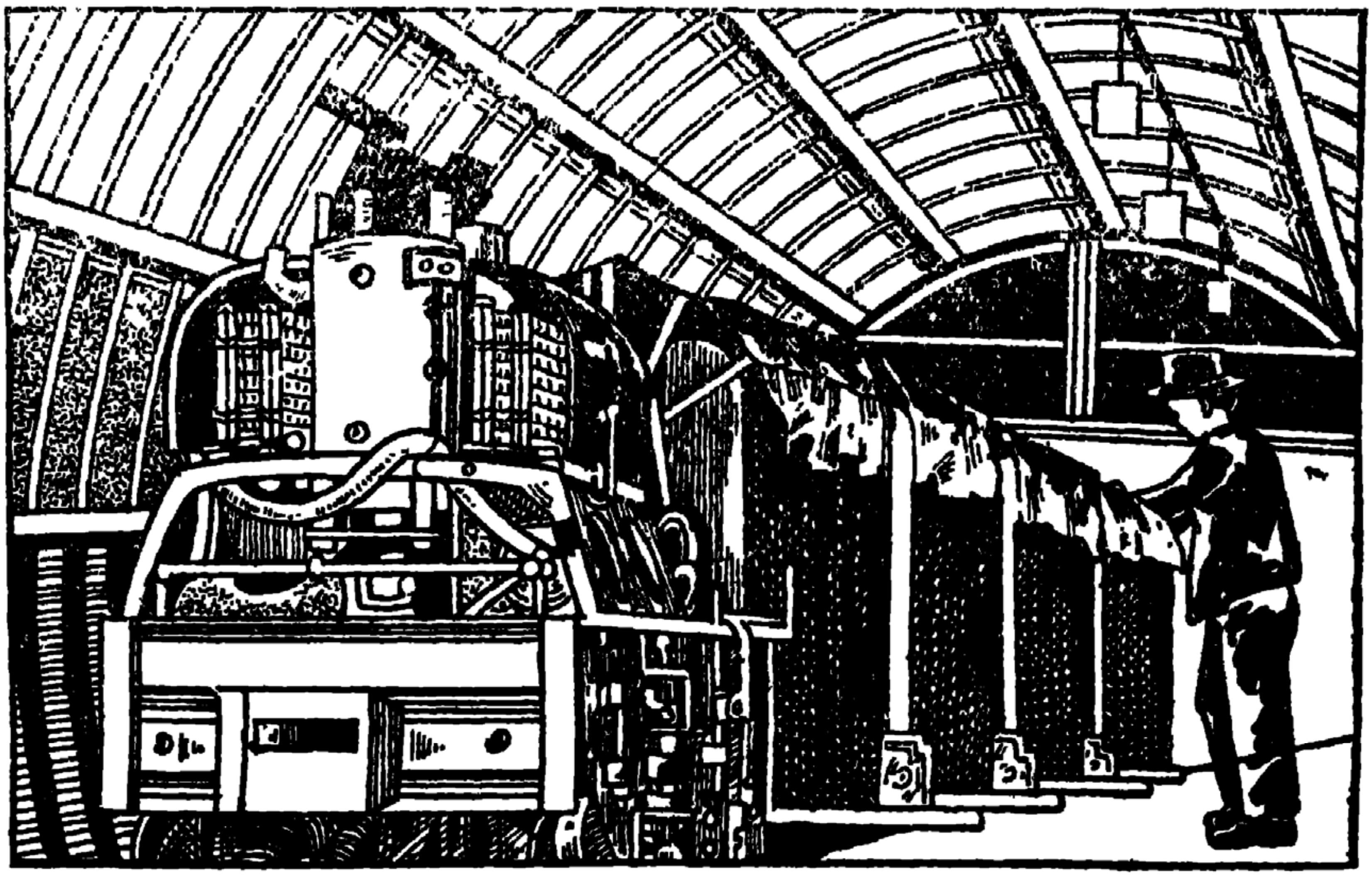

লণ্ডন জেনারাল পোষ্ট আফিসের পার্শেলবাহী রথীহীন রথ

ভূগর্ভের এই বিশাল পাতালপুরীর প্রতি কার্য্যটি করিতে বিজলী শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই বিজলী শক্তি উৎপাদন করিতে প্রতিদিন প্রায় ২২০০০ মন কয়লা প্রয়োজন হয়।

যন্ত্র কৌশলে বলীয়ান মানুষ এখন গাড়ী চালাইবার জন্য চালকেরও প্রয়োজন অনুভব করে না। একস্থানে বসিয়া মাত্র বিজলী চাবির (Switch) সাহায্যে সে সকল স্থানের কার্য্য এখন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। গত যুদ্ধের সময় লণ্ডন জেনারাল পোষ্ট আফিস (G. P. O.) হিসাব করিয়া দেখিল, লণ্ডনের মধ্যে একস্থান হইতে অন্য একস্থানে কেবলমাত্র পার্শ্বেল বহনের জন্য যে মোটর ভাড়া লাগে, উহা অপেক্ষা সস্তায় একটি ছোট টিউব রেলে ঐগুলি পাঠান চলে। সেই জন্য তাঁহারা কেবল মাত্র নিজেদের পার্শ্বেল বহিবার ছোট একটি টিউব রেলপথ (Tube Railway) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার গাড়ীগুলি আরও ছোট। এই গাড়ীগুলি চালাইবার জন্য চালক নিষ্প্রয়োজন। ষ্টেশনে গাড়ীগুলিতে পার্শ্বেল পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, এবং গন্তব্য স্থানে উহা পৌঁছিলে উহাকে থামাইয়া লইয়া সেই ষ্টেশনের পার্শ্বেলগুলি নামাইয়া লইয়া আবার গাড়ীখানিকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় মনে হয় জড় লৌহ যেন মানুষের বুদ্ধিবলে হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়াছে।